কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে যাকাতের ফাজায়েল, মাসায়েল ও অপরিহার্য বিষয়াবলীর উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব

প্রশ্নোত্তরে

কিতাবুয যাকাত

পরিচালক : মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।
খতীব : মারকাজ জামে মসজিদ, মোহম্মদপুর, ঢাকা।
সাবেক মুহাদ্দিস : জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ মাদ্রাসা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।
সাবেক শাইখুল হাদীস: জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল।
মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স
(মারকাজের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩, ০১৯২৫৯৩২৫৬৫
www.jumuarkhutba.wordpress.com

প্রশ্নোত্তরে

কিতাবুয যাকাত

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

সহযোগিতায়
মুফতী মুহা: রহমতুল্লাহ
শিক্ষক: মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ২০১১ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ: আগষ্ট ২০১২ ইং

বিঃ দ্রঃ কোন রকম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ব্যাতীত সম্পূর্ণ ফ্রী বিতরণের জন্য ছাপাতে চাইলে মারকাজ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল।

মূল্য: ৬০ (ষাট) টাকা মাত্র

Kitabuz Zakat
Shaikh Mufti Jashimuddin Rahmani
Markajul Ulom Al-Islamia, Dhaka
Price : 60.00 Tk. US.$ 5.00

আপনার সংগ্রহে রাখার মত লেখকের অন্যান্য কিতাব

১) কিতাবুল ঈমান
২) কিতাবুত তাওহীদ
৩) কিতাবুল আক্বাঈদ
৪) কিতাবুস সাওম
৫) কিতাবুয যাকাত
৬) কিতাবুল হজ্জ
৭) তাওহীদের মূল শিক্ষা
৮) বাইআত ও সীরাতে মুস্তাকিম
৯) মরনের আগে ও পরে
১০) কিতাবুদ দুআ
১১) দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থ: "তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দো'আ কর, নিশ্চয় তোমার দো'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সুরা তাওবা ১০৩)

উপহার

আমার
শ্রদ্ধেয়/স্নেহের..
....
....
........কে 'কিতাবুয যাকাত' বইটি উপহার দিলাম।

উপহারদাতা

....
....
....
সাক্ষর ও তারিখ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ

দ্বিতীয় প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ: ব্যবসায়িক পণ্যের উপর যাকাত

তৃতীয় প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ: শস্য ও ফলমূলের উপর যাকাত

চতুর্থ প্রকার: পশুর যাকাতের বিস্তারিত বিবরণ

পঞ্চম প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ

দ্বিতীয় অধ্যায়

যাকাতুল ফিতর

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

প্রথম অধ্যায়

বর্তমান পৃথিবীতে পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম- এই দুই প্রকারের অর্থব্যবস্থাই বাস্তবে প্রচলিত রয়েছে- অধুনা প্রায় সমগ্র পৃথিবীকে এই দুইটিই গ্রাস করে নিয়েছে। অথচ মানবতা এই উভয় ব্যবস্থায় মজলুম, বঞ্চিত ও নিপীড়িত। বস্তুত এই সব ব্যবস্থায় মানুষ যে কোনক্রমেই সুখী হতে পারে না, তা উভয় ব্যবস্থার আদর্শিক বিশ্লেষণ হতেই সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হবে।

পুঁজিবাদ

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ছয়টি মূলনীতি এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে। এ সম্পর্কীয় আলোচনার গোড়াতেই স্মরণ রাখতে হবে যে, পুঁজিবাদ নিছক একটি অর্থব্যবস্থা মাত্র নয় বরং একটি জীবন দর্শন- একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।

১) পুঁজিবাদ অর্থনীতির প্রথম ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানার সীমাহীন অধিকার। এতে কেবল নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি স্বীয় মালিকানায় রাখারই সুযোগ নয়, তাতে সকল প্রকার উৎপাদন-উপায় এবং যন্ত্রপাতি ইচ্ছামত ব্যবহার ও প্রয়োগেরও পূর্ণ সুযোগ লাভ করা যায়। ব্যক্তি নিজ ইচ্ছামত অবলম্বিত যে কোন পন্থা ও উপায়ে অর্থোপার্জন করতে পারে এবং যে-কোন পথে তা ব্যয় এবং ব্যবহারও করতে পারে; যেখানে ইচ্ছা সেখানে কারখানা স্থাপন করতে পারে এবং যতদূর ইচ্ছা মুনাফাও লুটতে পারে। শ্রমিক নিয়োগের যেমন সুযোগ রয়েছে, তাদেরকে শোষণ করে একচ্ছত্রভাবে মুনাফা লুন্ঠনের পথেও সেখানে কোন বাধা ও প্রতিবন্ধকতা নেই। ব্যক্তি বা গোটা সমাজ মিলিত হয়েও কাউকে কোন প্রকার কাজ হতে বিরত রাখতে পারে না- সে অধিকার কারো নেই।

২) মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানা লাভের জন্মগত ইচ্ছা রয়েছে। তার দাবি সম্পূরণ এবং এর বাস্তব রূপায়নের জন্য ব্যক্তিকে উপার্জন করার এবং এর ফল এক হাতে সঞ্চিত করে রাখার সুযোগ করে দেওয়া পুঁজিবাদের দ্বিতীয় মূলনীতি। তার মতে এই সুযোগ না দিলে মানুষ কিছুতেই অর্থোৎপাদনের জন্য উৎসাহী ও আগ্রণী হবে না।

৩) পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার তৃতীয় মূলনীতি হচ্ছে অবাধ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এটা কেবল বিভিন্ন শ্রেণী ও দলের মধ্যেই নয়, একই শ্রেণীর ও একই দলের বিভিন্ন লোকদের মধ্যেও এটা বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। মূলত এটা "বাঁচার লড়াই" (struggle for Existence) নামক দার্শনিকের শ্লোগান হতে উদ্ভূত। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মতে প্রতিযোগীতার অবাধ অর্থব্যবস্থায় কেবল সামঞ্জস্যেরই সৃষ্টি করে না, প্রচুর উৎপাদন ও তড়িতোৎপাদনেরও এটাই একমাত্র নিয়ামক। এটাই মানুষকে বিশ্বরহস্য উদঘাটন করে অভিনব আবিষ্কার উদ্ভাবনীর কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

৪) মালিক ও শ্রমিকের অধিকারে মৌলিক পার্থক্য করণ এই ব্যবস্থার চতুর্থ মূলনীতি। এই পার্থক্য যথাযথভাবে বর্তমান রেখেও নাকি পারস্পরিক সমস্যার সমাধান করা যায়। অথচ এর ফলে গোটা মানব সমাজ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে- একদল উৎপাদন- উপায়ের একচ্ছত্র মালিক হয়ে পড়ে, আর অপর দল নিতান্তই মেহনতী ও শ্রমবিক্রয়কারী জনতা। প্রথম শ্রেণীর লোক নিজেদের একক দায়িত্বে পণ্যোৎপাদন করে; তাতে মুনাফা হলে তা দ্বারা প্রত্যেকে নিজ নিজ সিন্ধুকই ভর্তি করে, লোকসান হলে তাও একাই নীরবে বরদাশ্‌ত করে। শ্রমিকদের উপর এর বিশেষ কিছু প্রভাব প্রবর্তিত হয় না। এরই ভিত্তিতে পুঁজিদারগণ নিজেদের অমানুষিক ও কঠোরতম কার্যকলাপকেও ন্যায়সঙ্গত প্রমান করতে চেষ্টা করে। পুঁজিদারদের যুক্তি এই যে, মূলধন বিনিয়োগ, পন্যোৎপাদন ইত্যাদিতে সকল প্রকার ঝুঁকি ও দায়িত্ব যখন তারাই গ্রহণ করে, তখন মুনাফা হলেও তা এককভাবে তাদেরই প্রাপ্য এবং শ্রমিকদেরকে শোষণ করারও তাদের অবাধ সুযোগ থাকা বাঞ্চনীয়। বস্তুত শ্রমিক শোষণই পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রধান হাতিয়ার।

৫) পঞ্চম মূলনীতি এই যে, রাষ্ট্র জনগনের অর্থনৈতিক লেনদেন ও আয় উৎপাদনের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এবং ব্যক্তিগণের কাজের অবাধ সুযোগ করে দেয়াই রাষ্ট্র-সরকারের দায়িত্ব। জনগণ যেন শান্তিপূর্ণভাবে অর্থনৈতিক চেষ্টা-সাধনা করতে পারে তার ব্যবস্থা করা এবং জনগনের ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার ও চুক্তিসমূহ কার্যকর করার সুবিধা দেয়াই রাষ্ট্রের কাজ।

৬) ষষ্ঠ মূলনীতিঃ সুদ, জুয়া প্রতারণামূলক কাজ-কারবার পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। বিনা সুদে কাউকে কিছুদিনের জন্যে 'এক পয়সা' দেওয়া পুঁজিবাদীর দৃষ্টিতে চরম নির্বুদ্ধিতা। বরং এর 'বিনিময়' অবশ্যই আদায় করতে হয় এবং তার হার পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট করে দেয়া আবশ্যক। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে হোক, অভাব-অনটন দূর করার জন্যই হোক, কোন প্রকারেই লেনদেন বিনাসূদে সম্পন্ন করা পুজিবাদী সমাজে অসম্ভব।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির উল্লিখিত মূলনীতিসমূহ একটু সূক্ষ্মভাবে যাঁচাই করে দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে, এটা কখনই সামগ্রিকভাবে মানবসমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারে না। এর মধ্যে দুই একটি বিষয় হয়ত এমনও রয়েছে যা কোন কোন দিক দিয়ে মানুষের পক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারে; কিন্তু তার সামগ্রিক পরিনাম হচ্ছে মানবতার পক্ষে মারাত্মক। শুরুতে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম পর্যায়ে এটা মানুষের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল বটে, কিন্তু এর প্রথম অধ্যায় অতিক্রান্ত হওয়ার পরই এর অভ্যন্তরীন ত্রুটি ও ধ্বংসকারিতা লোকদের সম্মুখে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। তারা দেখতে পায় যে, সমাজে ধনসম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে সত্য, কিন্তু তা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির সর্বগ্রাসী হস্তে কুক্ষিগত হয়ে পরছে আর কোটি কোটি মানুষ নিঃস্ব ও বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে। এটা ধনীকে আরো ধনী এবং গরীবকে একেবারে পথের ভিখারী করে দিচ্ছে। সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তার ভিত্তিমূলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে। একদিকে অসংখ্য পুঁজিদার মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। অপর দিকে দরিদ্র দুঃখী ও সর্বহারা মানুষের কাফেলা হামাগুড়ি দিয়ে চলে সীমাহীন-সংখ্যাহীন। পুঁজিবাদী সমাজে এই আকাশ-ছোঁয়া পার্থক্য দেখে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণও আজ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। অধ্যাপক কোলিন ক্লার্ক বলেছেন; বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে সর্বাপেক্ষা কম এবং সর্বাপেক্ষা বেশী আয়ের মধ্যে শতকরা বিশলক্ষ গুণ পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। এইরূপ পার্থক্য ও অসামঞ্জস্য এক একটি সমাজে যে কত বড় ভাঙ্গন ও বিপর্যয় টেরে আনতে পারে, তা দুনিয়ার বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে ও সমাজে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে।

পুঁজিবাদী সমাজের আর একটি মৌলিক ত্রুটি হল বাস্তব ক্ষেত্রে ধনিক শ্রেণীই হয় এর শাসক ও সর্বময় কতৃত্বের অধিকারী। তারা মিলিতভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা ও নির্ভীকতার সহিত গরীব, দু:খী, কৃষক ও শ্রমিককে শোষণ করে, তাদেরই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ও রক্ত পানি করে উপার্জিত ধন-সম্পদ নিজেদের ইচ্ছামত ব্যয় করে বিলাসিতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শণ করে, মানুষের বুকের রক্ত নিয়ে উৎসবের হোলী খেলায় মেতে উঠে। শক্তির নেশায় মত্ত হয়ে নিরীহ জনতার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। গোটা দেশের বিপুল অর্থসম্পদ বিন্দু-বিন্দু করে অল্প সংখ্যক লোকের হাতে সঞ্চিত হয়ে পড়ে- কুক্ষিগত হয়ে যায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন শোষকের হাতে। তখন সমাজের কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র ও অভাব-অনটনের গভীর তলদেশে নিমজ্জিত হয়। জাতিসংঘের সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট হতে জানা যায়, দুনিয়ার সর্বাধিক বৈষয়িক ও বাস্তব উৎকর্ষ লাভ হওয়া সত্ত্বেও এর শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও অধিক অধিবাসী প্রয়োজনানুরূপ খাদ্য, পোশাক, আশ্রয়, চিকিৎসা ও শিক্ষা হতে বঞ্চিত রয়েছে। এই তিক্ত সত্য হতে নি:সন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সুখী ও সুসমৃদ্ধ সমাজ গঠন করতে, সাধারণ মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও অধিকার আদায় করতে এবং মানব-সমাজে পরিপূর্ণ শান্তি ও স্বস্তি স্থাপন করতে পুঁজিবাদ চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। পুঁজিবাদভিত্তিক সমাজ উন্নত অর্থব্যবস্থার এক বিন্দু আলোকচ্ছটা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। বিখ্যাত অর্থনীতবিদ 'হবসন', 'কেরিয়া' এবং তাহার পর 'লর্ড কেইন্‌জ' পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার গভীরতর অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই তত্ত্ব উদঘাটিত করেছেন যে, জনগণের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এইরূপ অর্থব্যবস্থার গর্ভ হতেই জন্মলাভ করে। এইরূপ অর্থব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে ধন-সম্পদের অসম বন্টন। এই অসম বন্টনই দেশের কোটি কোটি নাগরিকের ক্রয়ক্ষমতা হরণ করে নেয়। এর ফলেই সমাজের মধ্যে সর্বধবংসী শ্রেণী-সংগ্রামের আগুন জ্বলে উঠে। বর্তমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ট পুঁজিবাদী দেশ আমেরিকায় সাম্প্রতিকালে এইরূপ পরিস্থিতিরই উদ্ভব হয়েছে। আমেরিকার পণ্যোৎপাদনের বিপুল পরিমাণের সহিত জনগণের ক্রয়-ক্ষমতা সামঞ্জস্য রক্ষা করতে সমর্থ হয় না বলেই তথায় বিপুল পরিমান পণ্য অবিক্রিত থেকে যায়। ফলে এক সর্বাত্মক অর্থনৈতিক বিপর্যয় সমগ্র দেশকে গ্রাস করতে

উদ্যত হয়। অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকায় বেকার লোকদের সংখ্যা ৭২ লক্ষ পর্যন্ত পৌছিবে বলে 'ফরচুন' নামক এক মার্কিন পত্রিকা আশংকা প্রকাশ করছে। আর এটাই হলো পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি।

কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র

পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে অর্থব্যবস্থা মানবসমাজে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদী সমাজের মজলুম শোষিত মানুষকে বুঝ দেয়া হয়েছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানাই সকল প্রকার বিপর্যয়ের মূল কারণ। এর উচ্ছেদেই সকল অশান্তি ও শোষন নির্যাতনের চির অবসান ঘটবে। তাদের প্রাথমিক শ্লোগানগুলো খুবই আকর্ষণীয় ছিল। যেমন: 'কেউ খাবে তো কেউ খাবে না, তা হবে না তা হবে না' 'কেউ দশতলায় কেউ গাছতলায়, তা হবে না তা হবে না' 'কারও কুকুর খায় খাসা, কারও নেই মাথা গোঁজার বাসা'। প্রথমে মানুষেরা দলে দলে এ মতবাদকে স্বাগত জানালো। কিন্তু পরবর্তীতে মানুষ বুঝতে সক্ষম হল যে, তাদের এই শ্লোগানগুলো ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া কিছুই না। কারণ একটা দেশ চালাতে হলে সেখানে নানান পেশা ও হাজারো স্তর তৈরি করার প্রয়োজন হয়। চৌকিদার, পুলিশ, এসপি, ডিসি, মেম্বার, চেয়্যারম্যান, এমপি, মন্ত্রি, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, পিয়ন থেকে শুরুকরে সচিব পর্যন্ত অনেকগুলো স্তর তৈরি করতে হয়।

তাছাড়া মানুষের শ্রম-শক্তি তিন প্রকার: **(ক)** বুদ্ধি শক্তি, জ্ঞান-প্রতিভা **(খ)** শৈল্পিক দক্ষতা ও কুশলতা **(গ)** দৈহিক বল।

(ক) বুদ্ধি বা মানসিক শক্তি চার প্রকারঃ (১) সাংবাদিকতা বিষয়ক (২) গবেষণামূলক (৩) সাংগঠনিক কার্য সম্বন্ধীয় (৪) বিচার বিভাগীয়।

(খ) শৈল্পিক দক্ষতা ও কুশলতা তিন প্রকারঃ (১) কৃষিকাজে দক্ষতা (২) শিল্পকার্য সম্পর্কীয় দক্ষতা এবং (৩) বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় দক্ষতা।

(গ) দৈহিক শক্তি কেবল মজুর ও শ্রমিক-শ্রেণীর লোকদের জন্যই একটি উৎপাদক উপায়। তারা সাধারণত এই একটি মাত্র শক্তির সাহায্যেই জীবিকা উপার্জন করে থাকে। মস্তিষ্ক বা চিন্তাশক্তি থাকলেও তা প্রয়োগের

খুব বেশী আবশ্যক হয় না, অবকাশও থাকে না। বস্তুত এই শ্রেণীর লোকেরা সমাজের মেহনতী জনতারই প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে। সকল প্রকার কাজের লোক এদের মধ্য থেকেই পাওয়া যায়। আর সমাজের সকল বিভাগে প্রয়োজন অনুযায়ী এরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং সকল মানুষকে সমান করা সম্ভব না। যদি বলা হয় ক্ষমতায় তারতম্য হবে তবে সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সকলেই সমান হবে। এটাও সম্পূর্ণ অবাস্তব কথা। কারণ এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা লেলিন, কার্ল মার্কস, মাও সেতুংগংদের জীবনযাত্রা আর সেদেশের সাধারণ মানুষদের জীবনযাত্রা কখনোই এক ছিল না। এছাড়া কমিউনিজমের অর্থনীনিতে প্রথম পদক্ষেপেই ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে এবং অর্থ উৎপাদনের সমস্ত উপায়-উপাদান ও যন্ত্রপাতি জাতীয় মালিকানা বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ফলে কমিউনিস্ট সমাজে জাতীয় অর্থোৎপাদনের উপায়-উপাদানের উপর রাষ্ট্রপরিচালক মুষ্টিমেয় শাসক-গোষ্ঠির নিরংকুশ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে। তারা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিশেষ প্লান-প্রোগ্রাম ও পরিকল্পনা অনুযায়ী উপায় উপাদান ব্যবহার করে থাকে। তাদের নির্ধারিত নীতি অবনত মস্তকে মেনে নিতে একান্তভাবে বাধ্য হয় সে সমাজের কোটি কোটি মানুষ। এভাবে দেশের সমস্ত মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে মুষ্টিমেয় কয়েক জন শাসকগোষ্ঠির গোলামে পরিণত করা হয়েছিল। কি চমৎকার বুদ্ধি! পুঁজিবাদের শোষণের ছিদ্রপথ বন্ধ করে দেয়ার জন্য গোটা দেশবাসীকে গরু-ছাগল আর হালের বলদের ন্যায় জীব-জন্তুতে পরিণত করে যতদিন কাজ করতে পারবে ততদিন আদর-কদর। আর যখন কাজের ক্ষমতা থাকবে না তখন তারা মূল্যহীন। এটা যেন এরকমই যে একজন লোকের মাথাব্যাথা হয়েছিল। তিনি ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য গেলে ডাক্তার সাহেব বললেন, মাথা ব্যাথার ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্য মাথাটা কেটে ফেলে দেও।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার আরেকটি খারাপ দিক ছিল এই যে, এখানে যে যত বেশীই কাজ করুক না কেন তাতে তার ব্যক্তিগত কোন ফায়দা ছিল না। বেতন-ভাতা সকলের জন্যই সমান। এতে দেশের আয়-উন্নতি ব্যাহত হতে লাগল। অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়তে লাগল। কারণ "মানুষ লাভের লোভী" যদি ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করা হয় তাহলে লাভের আশায় বেশী শ্রম

দেয়। আর যদি মনে করে যে, শ্রম যতই দেই না কেন আমার ভাগ্যে দুই রুটিই আছে। তাহলে কেউ অতিরিক্ত শ্রম দেবে না। এভাবে একদিকে মানুষের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করা হলো অপরদিকে দেশের সাধারণ অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়তে লাগল। তখন এই মতবাদকে তার জন্মভূমি রাশিয়াতেই মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। এবং এর প্রতিষ্ঠাতাদের বড় বড় মুর্তিগুলোকে ক্রেন লাগিয়ে ভেঙ্গে চুড়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। আমাদের দেশে এখনও কিছু খুচরা কমিউনিস্ট দেখা যায়। যারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এখনো মিছিল-মিটিং ও কাস্তে-কুড়ালের ব্যানার-পোষ্টার নিয়ে ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মূলতঃ এরা সাগড়ে ভাটা লাগলেও খালে জোয়ার আনার ব্যর্থ চেষ্টা লিপ্ত আছে।

উপরোক্ত কমিউনিজম ও পুঁজিবাদ উভয়উ দ্বীনহীনতা ও ধর্মহীনতার (secularism) গর্ভ হতে উদ্ভুত বলে উভয় সমাজের মানুষই মানুষত্যের মহান গুন-গরিমা হতে বঞ্চিত হয়েছে। এটা মানুষকে নিতান্ত পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। মানুষ আকৃতি বিশিষ্ট এই পশুগণ তাই আজ পরস্পরের সহিত শ্রেণী সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামে যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার বিধানের মাধ্যমে এই উভয় প্রকার অর্থনীতির মধ্যে সামঞ্জস্যতার সৃষ্টি করা হয়েছে। একদিকে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করা হয় যাতে মানুষেরা স্বাধীনভাবে কাজ-কর্ম করে বেশী বেশী আয় উৎপন্ন করতে পারে। এর মাধ্যমে সমাজতন্ত্রিদের মতো গোটা দেশবাসীকে মুষ্টিমেয় শাসকগোষ্ঠির গোলামে পরিণত হতে হয় না। আর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকায় প্রতিযোগিতামূলক আয়- উৎপাদনও ব্যাহত হয় না। কিন্তু এই মালিকানাটা আল্লাহ সুবঃ এর মালিকানার আওতাধীন। আর আল্লাহ সুবঃ মানুষের এই মালিকানার মধ্যে গরীবের অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

[وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات: ١٩

অর্থ: “আর তাদের (ধনীদের) মালের মধ্যে রয়েছে প্রার্থি ও বঞ্চিতদের অধিকার।”[১]

[১] সুরা জারিয়াত ১৯।

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, ধনীর যত সম্পদ উপাজন করবে ঢালাওভাবে তারা সেই পূর্ণ সম্পত্তির মালিক নয়। বরং তাদের মালের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে গরীর, দুঃখী ও অসহায় মানুষের। আর এভাবে যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালু থাকলে গরীবদের আর সুদে টাকা নেওয়ার দরকার হবে না। বরং রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় করে সুপরিকল্পিতভাবে বন্টনের মাধ্যমে ধনী-গরীবদের এই আকাশচুম্বি ব্যবধান কমিয়ে আনা হবে। যাকাতভিত্তিক এই অর্থব্যবস্থাই হচ্ছে দারিদ্র বিমোচনের আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র সঠিক পথ। আজ মুসলিম জাতি যদি যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতো তাহলে আর তাদেরকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান তথা অমুসলিম রাষ্ট্রের কাছে ভিক্ষার ঝুলি সম্প্রসারণ করতে হতো না। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাঃ ইরশাদ করেছেন:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى

অর্থ: “হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ‘উপরের হাত (দানকারীর হাত) নিচের হাত (দানগ্রহণকরীর হাত) থেকে উত্তম।”[২]

অর্থাৎ দাতার হাত গ্রহীতার হাত থেকে উত্তম। আরও খুলে বললে অর্থ দাঁড়ায়- যে মানুষ অপর মানুষকে টাকা-পয়সা, অর্থ-বিত্ত, সম্পদ, খাদ্য-বস্তু ইত্যাদি জীবনোপকরণ, জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রযুক্তি, সামরিক উপকরণ, চিকিৎসা উপকরণ, উন্নত চাষাবাদের উপকরণসহ যা কিছু প্রদান করবে, সেই ব্যক্তি-গোষ্ঠি এসব বস্তু গ্রহণকারীর তুলনায় উত্তম অর্থাৎ এসব প্রয়োজনীয় বস্তুর দাতা-গ্রহীতা যেমন ব্যক্তি মানুষ হতে পারে। তেমনি জাতিগত, রাষ্ট্রগত পর্যায়ের হলে তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হবে গ্রহীতা দেশটির ওপর। অতঃপর দাতা দেশটি নিষ্ঠাবান হলে তাতে সাহয্যপ্রাপ্ত দেশটি উপকৃত হয়। আর তার মধ্যে যদি আধিপত্যবাদের মনোভাব প্রবল থাকে, তাহলে সাহায্য গ্রহণকারী দেশটির জন্য তা অনেক ক্ষেত্রে অমঙ্গল ও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

[২] সহীহ বুখারী ১৪২৭; সহীহ মুসলিম ২৪৩২; সুনানে তিরমিজী ৬৭৫; সুনানে নাসায়ী ২৫৩২।

পরিতাপের বিষয়, সময়ের বিবর্তনে মুসলিমরা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর গুরুত্বপূর্ণ বাণীর তাৎপর্য যথাযথভাবে উপলব্ধিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই আজ তারা ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পৃথিবীর দাতা শক্তিগুলোর মুখাপেক্ষি। মুসলিমরা দাতার হাতের অধিকারী হতে না পারায় আজ ব্যক্তিগত, জাতীয়, আন্তর্জাতিক সব পর্যায়ে পরমুখাপেক্ষী। হাদীসে উল্লিখিত 'উপরের হাত' তথা দাতার হাত বলতে যদি ফকির-মিসকিনকে দু'চার পয়সা খয়রাত ও সাহায্যদানের অর্থ অন্তরে প্রবল না রেখে বিষয়টি উল্লিখিত ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হতো, তাহলে মুসলিমদের অবস্থা ভিন্নতর হতো। বরং রাস্তার ফকির-মিসকিনদের চেয়েও আজ মুসলিম দেশের শাসক, মন্ত্রী, এমপিগুলো বড় ভিক্ষুক। কারণ রাস্তার ফকির-মিসকিনদেরকে মানুষেরা ভিক্ষা দেয় কোন প্রকার শর্তারোপ করা ছাড়া। আর রাষ্ট্রিয় ভিক্ষুকদেরকে বিদেশী রাষ্ট্রগুলো ভিক্ষা দেয় শর্ত সাপেক্ষে। আবার কখনো কখনো বিদেশী দাতাগোষ্ঠিগুলো নিজেদের দানের একটি অংশ কেটে রেখে দেয় যা রাস্তার দু-চার পয়সার ফকির-মিসকিনদেরকেও লজ্জিত করে।

মূলত: এই দারিদ্রতা দূর করার জন্যই পবিত্র কুরআনে যাকাত ফরজ করা হয়েছে। এই নির্দেশের তাগিদ হলো, সম্পদের অধিকারী হয়ে তুমি অহংকারী ও কৃপণ হয়ো না, বরং মানবতার সেবায় সে সম্পদ ব্যবহার করো। পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সব ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে সম্ভাব্য সব কাজের উদ্যোগ নাও। এজন্য সুষ্ঠ পরিকল্পনা করো। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবঃ তাঁর বান্দাদের এ মর্মে দু'আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ: 'রাব্বানা আতিনা ফিদদুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানা'। অর্থাৎ: "হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এই বস্তুজগতেও হাসানা বা সুখ-সমৃদ্ধি ও কল্যাণ দান করুন আর আখিরাতেও। আর আমাদের রক্ষা করুন জাহান্নামের শাস্তি থেকে।"[৩]

[৩] সুরা বাকারা ২০১।

এই জাগতিক জীবনে জাতির যাবতীয় সম্পদ দুর্নীতিবাজ, লম্পট, চরিত্রহীন নেতৃত্বের হাতে তুলে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা:) সে নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার নীতি গ্রহণ করেননি। দেশরক্ষা, জাতিগঠন, দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, প্রচার মাধ্যম, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, অর্থনৈতিক চাবিকাঠি কোনোটাই আল্লাহর রাসূল (সা:) আবু লাহাব-আবু জাহেলের নেতৃত্বের হাতে ছেড়ে দিয়ে জাতিকে অর্থনৈতিক এতিম বানানোর নীতি গ্রহণ করেননি। উম্মতকেও এমন আহম্মকি করার তিনি অনুমতি দেননি। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর মাত্র ১৩ বছরে তিনি তাঁর জাতিকে এতটা সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন যে আরবে যাকাত নেয়ার মতো কোন লোক ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা:) যেদিন বাইতুল মাল উদ্বোধন করছিলেন সেদিন এমন এক ঘোষনা দিলেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে কোন অর্থনীতিবীদ অথবা কোন লিডারের পক্ষে এ পর্যন্ত দেয়া সম্ভব হয়নি। এবং আশা করা যায় কেয়ামত পর্যন্ত সম্ভব হবেও না। সেই ঐতিহাসিক ভাষনটি হাদীসের পাতায় এখনও অমর হয়ে আছে। তাহচ্ছে:

مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَىَّ وَعَلَىَّ

অর্থ: "কোন ব্যক্তি সম্পদ রেখে মারা গেল তা তার ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন হবে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি ঋণ রেখে অথবা অসহায় স্ত্রী-সন্তান রেখে মারা গেল, তার সকল ঋণ ও অসহায় স্ত্রী-সন্তানের দায়-দায়িত্ব আমার প্রতি এবং আমার স্কন্ধে আমি তা তুলে নিলাম।"[৪]

আজও তাঁর আর্দশ গ্রহণ করলে পৃথিবী এমনি স্বাচ্ছন্দ্যময় ও সুখি-সুন্দর হয়ে উঠতে পারে।

তাই আসুন! আমরা যাকাত সম্পর্কে ভালভাবে জানার চেষ্টা করি এবং যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে এগিয়ে যাই হেরার আলোকজ্জল দীপ্ত রাজপথের দিকে। কায়েম করি ইনসাফ ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন!

আপনাদের দ্বীনি ভাই
মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

[৪] সহীহ মুসলিম ২০৪২; সুনানে আবূ দাউদ ২৯৫৬।

প্রশ্ন: যাকাত শব্দের শাব্দিক অর্থ কি?

উত্তর: যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে: اَلْبَرَكَـــةُ (বরকত), اَلنُّمَـــاءُ (বৃদ্ধি), اَلطَّهَارَةُ (পবিত্রতা) ও اَلصَّلَاحُ (পরিশুদ্ধ) ইত্যাদি ।

প্রশ্ন: ইসলামী শরিয়তের পারিভাষিয়ায় যাকাত কাকে বলে?

উত্তর: ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় যাকাতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ:) বলেন,

اَلزَّكَاةُ شَرْعًا :حِصَّةٌ مُقَدَّرَةٌ مِنْ مَالٍ مَخْصُوْصٍ فِيْ وَقْتٍ مَخْصُوْصٍ يُـــصْرَفُ فِـــيْ جِهَاتٍ مَخْصُوْصَةٍ

অর্থ: "নিদিষ্ট মালে (নেসাব পরিমান মালে), নিদিষ্ট সময়ে (চন্দ্রমাস হিসাবে বৎসর পূর্ণ হলে), নির্দিষ্ট খাতে (কুরআনে বর্ণিত আটটি খাতে) ব্যয় করার জন্য নির্দিষ্ট অংশ (যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আলোচনা করা হবে) আদায় করার নাম যাকাত ।"[৫]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কতৃক রচিত 'ইসলামী বিশ্বকোষ' খন্ড **২১** পৃষ্ঠা ৪৭৫ এ বলা হয়েছে, "ধন সম্পদের যে নির্ধারিত অংশ শরিয়তের বিধান মোতাবেক আল্লাহর পথে ব্যয় করা মানুষের উপর ফরজ করা হয়েছে তাকেই যাকাত বলে" ।

প্রশ্ন: যাকাতের আভিধানিক অর্থ এবং পারিভাষিক অর্থের মধ্যে সম্পর্ক কি?

উত্তর: যিনি যাকাত দিবেন যাকাত দেওয়ার কারণে তার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, পবিত্র হবে ও তাতে বরকত হবে । এছাড়া ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহ:) বলেন, যাকাতের মাধ্যমে যাকাত প্রদানকারীর মন পবিত্র হয় এবং তার সম্পদে বরকত হয় ও বৃদ্ধি পায় । সাথে সাথে উহা বালা-মুসিবত থেকেও রক্ষা করে ।[৬]

[৫] ফিকহুস সুন্নাহ (আলবানী র.) ২/৫ ।

[৬] মাজমূউ'ল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যা ৫/৪৯২ ।

প্রশ্ন: ইসলামে যাকাতের হুকুম (বিধান) কি?

উত্তর: ইসলামি শরিয়া' অনুযায়ী যার উপর যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলী পাওয়া যাবে তার উপর যাকাত 'ফরজে আইন' এবং এটি ইসলামের পঞ্চবেনার একটি । কুরআন, হাদীস এবং ইজমা দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত ।

কুরআনের দলীল: পবিত্র কুরআনের অসংখ্য স্থানে আল্লাহ (সুব:) যাকাত ফরজ হওয়া এবং তার গুরুত্বের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন । ইরশাদ হয়েছে:

{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة : ١١٠]

অর্থ: "আর তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও ।"[৭]

এখানে সালাতের সাথে যাকাত প্রদান করতে আদেশ করা হয়েছে । অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة : ١٠٣]

অর্থ: "তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা (যাকাত) নাও । এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে । আর তাদের জন্য দু'আ কর, নিশ্চয় তোমার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর । আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ।"[৮]

হাদীসের দলীল: রাসূলুল্লাহ (সা:) পবিত্র হাদীসে ইরশাদ করেন:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । আল্লাহর একাত্বতা ঘোষণা করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমজানে সিয়াম পালন করা এবং হজ্জ করা ।"[৯]

এই হাদীসে ইসলামকে একটি তাবুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । যার পাঁচটি খুঁটি বা পিলার থাকে । ইসলামের এই পাঁচটি পিলারের একটি হলো 'যাকাত' । মালের যাকাত ফরজ এবং ইসলামের পঞ্চবেনার একটি এ

[৭] সুরা বাকারা ১১০ ।

[৮] সুরা তাওবা ১০৩ ।

[৯] সহীহ মুসলিম ১৯ নং হাদীস; সহহি বুখারী ৮ নং হাদীস; সুনানে তিরমিজি ২৬০৯ নং হাদীস ।

ব্যাপারে গোটা মুসলিম উম্মাহ্ একমত। কারো কোন দ্বিমত নেই। যে ব্যক্তি যাকাত ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করবে সে কাফের ও মুরতাদ বলে বিবেচিত হবে।

মুআ’জ ইবনে জাবাল (রা:) এর প্রসিদ্ধ হাদীস যেখানে যাকাতকে ফরজ করা হয়েছে:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

অর্থ: “ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) মুআ’জ ইবনে জাবাল (রা:) কে ইয়ামনে পাঠানোর সময় বললেন, প্রথমে তুমি তাদেরকে এই কালেমার সাক্ষী দেওয়ার জন্য আহবান জানাবে যে, “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল”। যদি তারা এটা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ (সুব:) তাদের উপর দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। যদি তারা এটারও আনুগত্য করে তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব:) তাদের মালের মধ্যে সাদাকাহ ফরজ করেছেন। যা তাদের ধনীদের থেকে নেয়া হবে এবং তাদের গরীবেদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।”[১০]

ইজমা : সমস্ত উম্মত এই ব্যাপারে একমত যে, যাকাত ফরজ। এমনকি রাসুল্লাহ (সা:) এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কেউ এর বিরোধিতা করেনি।

প্রশ্ন: নিসাব কি এবং ‘মালিকে নিসাব’ কাকে বলে?

উত্তর: কমপক্ষে যে পরিমাণ মাল থাকলে যাকাত ফরজ হয় তাকে ‘নিসাব’ বলে। ঋণ ও মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমান সম্পদের মালিককে ‘মালিকে নিসাব’ বলে। নিসাব পরিমাণ মালের কম থাকলে তার

[১০] সহীহ বুখারী ১৩৯৫।

উপর যাকাত ফরজ হবে না। আর নিসাবের চেয়ে বেশী সম্পদ থাকলে তার উপর নিসাব সহ পুরো সম্পদের যাকাত প্রদান করা ফরজ।

প্রশ্ন: যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত কয়টি ও কি কি?

উত্তর: যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত পাঁচটি ঃ

১। ইসলাম সুতরাং কোন অমুসলিমের উপর যাকাত ফরজ নয়।

২। স্বাধীন সুতরাং কৃতদাস ও দাসীর উপর যাকাত ফরজ নয়।

৩। ‘মালিকে নিসাব’ হওয়া সুতরাং নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু যথা: বাসস্থান, পরিধেয় বস্ত্র, ঘরের আসবাবপত্র, ব্যবহারের যানবাহন, খেদমতের দাস-দাসী ও সমরাস্ত্র বাদ দিয়ে নিসাবের চেয়ে কম মালের মালিকের উপর যাকাত ফরজ হবে না।

৪। মালের পূর্ণ দখল থাকা সুতরাং সরকারী বা কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জি,পি - সি,পি ও প্রভিডেন্টফান্ডে বাধ্যতামূলকভাবে যে টাকা কেটে রাখা হয় তা হাতে আসার পূর্বে তার উপর যাকাত ফরজ নয়। চাকুরী শেষে যখন ঐ টাকা উঠানো হবে, তখন পূর্ব হতে নিসাবের মালিক না থাকলে উক্ত টাকার উপরে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার উপর যাকাত ফরজ হবে। তবে যদি পূর্ব হতে নিসাবের মালিক হয়ে তাকে, তাহলে পূর্বের টাকার যাকাত দেওয়ার সময় জি.পি, সি.পি এবং প্রভিডেন্টফান্ড হতে প্রাপ্ত টাকারও যাকাত দিতে হবে, সেক্ষেত্রে ঐ টাকার উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরী নয়। তবে যদি কর্মচারী উক্ত প্রভিডেন্ট ফান্ডে বাধ্যতামূলক পরিমাণের অতিরিক্ত অর্থ রাখে অথবা কর্মজীবী যদি স্ব-উদ্যোগে ঐ ফান্ডের সঞ্চিত অর্থ অন্য কোন ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে স্থানান্তর করিয়ে নেয় সে ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ স্বতন্ত্রভাবে বা অন্য যাকাতযোগ্য মালের সাথে যোগ হয়ে নিসাব পরিমাণ হলে যথা নিয়মে তার উপর যাকাত ফরজ হবে।

৫। চান্দ্রমাস হিসাবে এক বছর অতিবাহিত হওয়া। সুতরাং এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মালেই যাকাত ফরজ হবে না। তবে জমি হতে উৎপন্ন ফসল ও ফল-মূল ছাড়া (এগুলোতে কাটার সময়ই যাকাত দিয়ে দিতে হবে)।

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আরেকটি শর্ত হলো: অন্যান্য ইবাদতের মত যাকাতের ক্ষেত্রেও বালেগ (পূর্ণ বয়স্ক) ও আ'কেল (সুস্থ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া শর্ত)। সুতরাং হানাফী মাযহাব অনুযায়ী পাগল ও নাবালেক নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হলেও তার উপর যাকাত ফরজ হবে না। কেননা শরিয়তের বিধান ফরজ হওয়ার জন্য সাবালক এবং স্বজ্ঞান হওয়া শর্ত। কিন্তু অন্যান্য সকল ইমাম, ফক্বীহ ও মুহাদ্দিসীনদের মতে নাবালেগ শিশুর মালেও যাকাত ফরজ হবে। তাদের দলীল:

عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ابْتَغُــوا بِــأَمْوَالِ الْيَتَامَى لاَ تَأْكُلُهَا الصَّدَقَة

অর্থ: "সাঈদ ইবনে মুসাইব থেকে বর্ণিত তিনি ওমর ইবনে খাত্তার (রা:) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, তোমরা ইয়াতিমদের মাল দ্বারা ব্যবসা কর, যাতে সাদাকাহ পুরা মাল খেয়ে না ফেলে ।"[১১] এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল বাচ্চাদের মালের উপর যাকাত ফরজ হবে। অন্যথায় ওমর (রা:) যাকাত আদায় করতে বলতেন না।

হানাফীগণ বলেন, এই ক্ষেত্রে বর্ণিত হাদীসটি দূর্বল তাই তার উপর আমল করা যায় না। সুতরাং পাগল এবং নাবালেক বাচ্চার মালের উপর যাকাত আদায় করা আবশ্যক নয়।

তবে হানাফীদের বক্তব্য সম্পূর্ণ সঠিক নয় কারণ, এই ব্যাপারে তিরমিজীতে যে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে তা দূর্বল। কিন্তু আমরা এখানে বাইহাকীতে সহীহ সনদে বর্ণিত রেওয়ায়াত নিয়ে এসেছি। এছাড়াও যে সমস্ত আয়াত বা হাদীসে যাকাতকে ফরজ করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যাকাত ধনীদের মাল থেকে নেয়া হবে। ধনী শিশু না বয়স্ক এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য করা হয়নি। সুতরাং ব্যাপকভাবে শিশু-বয়স্ক সকল ধনীদের মাল থেকে যাকাত নেয়া হবে।

প্রশ্ন: যাকাতের মধ্যে কোন ধরনের ঋণ মূল টাকা হতে বাদ দিতে হবে? স্বল্প মেয়াদী ঋণ, না দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ? যারা বড় বড় ব্যবসা করে, তারা ব্যাংক হতে যে লোন নেয় তার এক অংশ নিয়ে মিল ইন্ডাষ্ট্রী

[১১] সুনানে বাইহাকী ১১৩০০।

করে আর বাকী টাকা দিয়ে মাল কিনে। এখন প্রশ্ন হলো, এই দুই প্রকার করযের হুকুম কি? অর্থাৎ, যাকাত দেয়ার সময় উভয় প্রকার করয মূল টাকা হতে বাদ দিবে? না উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে?

উত্তর: যদি কেউ হাজতে আসলিয়া অর্থাৎ, নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু যথা বাসস্থান, পরিধেয় বস্ত্র, ঘরের আসবাবপত্র, যানবাহন ইত্যাদি বাবদ ঋণ করে তাহলে এই ঋণ স্বল্প মেয়াদী হোক আর দীর্ঘ মেয়াদী হোক পুরোটাই যাকাতের নিসাব হতে বাদ দেয়া হবে। আর যদি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্যে নয় বরং ব্যবসা-বানিজ্য, মিল-কারখানার জন্য শিল্প ঋণ নেয়া হয় তখন দেখতে হবে ঐ টাকা কোথায় লাগানো হয়েছে। যদি ঐ টাকা দিয়ে এমন কিছু করা হয় যার উপর যাকাত আসে না, যেমন: মিল-কারখান, মেশিনারী বস্তু ইত্যাদি তাহলে ঐ ঋণ যাকাতের নিসাব হতে বাদ দেয়া যাবে না। কারণ, এ ঋণ নিয়ে যেহেতু সম্পদ তথা মিল-কারখান করা হয়েছে, সুতরাং এ ধরণের ঋণ যাকাতের নিসাব হতে বাদ দেয়া হবে না। কাজেই এ ধরণের ঋণ থাকা স্বত্ত্বেও কারো নিকট যদি নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ-রূপা বা নগদ ক্যাশ কিংবা ব্যবসার মাল থাকে, তাহলে ত ার উপর যাকাত ফরজ হবে। আর যদি উক্ত ঋণ দিয়ে ব্যবসার মালামাল ক্রয় করা হয়, তাহলে সেই ঋণ হতে চলতি বৎসরের পরিশোধযোগ্য কিস্তি পরিমাণ যাকাতের নিসাব থেকে বাদ দেয়া হবে। এমনিভাবে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ কিস্তি পরিশোধ করতে হবে সে পরিমাণ ঋণ বাদ দিয়ে বাকী সম্পদের উপর ঐ বৎসরের যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন: কোন কোন মাল কি পরিমাণ হলে কতটুকু যাকাত দিতে হবে?

উত্তর: পাঁচ প্রকার মালে যাকাত ফরজ হয়। **(১)** স্বর্ণ, রৌপ্য, মুদ্রা, অলংকার, শেয়ার ও সিকিউরিটির উপর যাকাত। **(২)** ব্যবসায়িক-বানিজ্যিক পণ্য, শিল্প ও কোম্পানীর উপর যাকাত। **(৩)** শস্য ও ফলমূলের উপর যাকাত। **(৪)** গাবাদি পশুর উপর যাকাত। **(৫)** খামারে উৎপাদিত সম্পদের উপর যাকাত। **(৬)** অন্যান্য ক্ষেত্রে যাকাত।

প্রথম প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ

বিহিত মুদ্রা (স্বর্ণ, রৌপ্য এবং নোট) এর উপর যাকাত

বিহিত মুদ্রার সংজ্ঞা: বিহিত মুদ্রা (Legel Tender) বলতে সব ধরনের ধাতব মুদ্রা ও ব্যাংক নোটকে বুঝায় (যা বিনিময় হিসাবে গ্রহণ বা প্রদান করতে আইনত বাধ্য), তা যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তির দেশ অথবা অন্য কোন দেশ কর্তৃক প্রচারিত হোক না কেন।

বিহিত মুদ্রার উপর যাকাতের বাধ্যবাধকতা: পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজ'মার মাধ্যমে বিহিত মুদ্রার উপর যাকাত ফরজ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة : ٣٤ ، ٣٥]

অর্থ: "যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেয়া হবে। (আর বলা হবে) 'এটা তা-ই যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর।"[১২]

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ « مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّىَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ .

অর্থ: "উম্মে সালামা (রা:) বলেন, আমি স্বর্ণের নুপুর পরিধান করতাম। রাসূলুল্লাহ (সা:) কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি كَنْز (পুঞ্জিভূত সম্পদের) অর্ন্তভূক্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, যে সম্পদ যাকাত পরিমান হয় এবং তার যাকাত আদায় করে দেয়া হয় সেটা كَنْز (পুঞ্জিভূত সম্পদ) নয়।"[১৩] অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

[১২] সুরা তাওবা ৩৪-৩৫।
[১৩] সুনানে আবু দাউদ ১৫৬৬। হাদীসটি হাসান।

عن ابي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِىَ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ

অর্থ: "আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মালিকানাধিন স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত প্রদান করে না, কিয়ামতের দিন সেই স্বর্ণ ও রৌপ্যকে আগুনের পাতে রূপান্তরিত করা হবে এরপর তা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তার কপাল, পার্শ্বদেশ ও পিঠে ছেঁকা দেওয়া হবে।"[১৪]

যুগ যুগ ধরে মুসলিমরা সর্বসম্মতভাবে মেনে আসছেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর যাকাত প্রদান করা ফরজ এবং সদৃশ বস্তু বলে সকল ধরনের মুদ্রার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে সকল ধরনের কাগুঁজে নোট যাদের ক্রয় ক্ষমতা আছে তাও মুদ্রা বলে গণ্য হবে এবং সেগুলোর ক্ষেত্রে স্বর্ণ ও রৌপ্য এর মতই মুনাফা গ্রহণ, যাকাত প্রদান, অগ্রিম প্রদান ও অন্যান্য বিধান সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

বিহিত মুদ্রার নিসাব: কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন সম্পত্তির পরিমাণ ইসলামি বিধানে নির্ধারিত সর্বনিম্ন সীমা (নিসাব) অতিক্রম করলেই তার উপর যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক (ফরজ) হয়। যাকাতের জন্য বিবেচ্য সর্বনিম্ন স্বর্ণ ও স্বর্ণমুদ্রা হচ্ছে ২০ মিসকাল বা ২০ দিনার (১ মিসকাল সমান ৪.২৫ গ্রাম) অর্থাৎ ৮৫ গ্রাম খাঁটি স্বর্ণ। তোলা বা ভরির হিসাবে তা সাড়ে সাত তোলা বা ভরি হয়।

যাকাতের জন্য বিবেচ্য সর্বনিম্ন পরিমাণ রৌপ্য বা রৌপ্যমুদ্রা হচ্ছে ২০০ দিরহাম (এক রৌপ্য দিরহাম ২.৯৭৫ গ্রামের সমান) অর্থাৎ ৫৯৫ গ্রাম। তবে হিসাবের সামান্য হেরফেরের দিকে লক্ষ্য রেখে ৬০০ গ্রাম নিসাব নির্ধারণ করা উচিত হবে। তোলা ভরির হিসাবে তা সাড়ে বাহান্ন তোলা বা ভরি হয়।

[১৪] সহীহ মুসলিম ২৩৩৭।

নগদ টাকা অথবা ব্যবসায়ের পণ্যের যাকাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বর্ণের নিসাব প্রযোজ্য না রৌপ্যের নিসাব

এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে দু'টি মতামত রয়েছে।

এক: হানাফী ওলামায়ে কেরামগণ এক্ষেত্রে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্য থেকে বাজারে যেটার মূল্য কম থাকবে অর্থাৎ যেটার মূল্য হিসাব করলে যাকাত ফরজ হয় সেটার নিসাবের সাথে মিলাতে হবে। এতে গরীবদের লাভের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। কেননা বর্তমানে স্বর্ণের মূল্য হিসাব করলে অনেকের উপরই যাকাত ফরজ হবে না কিন্তু রৌপ্যের মূল্য হিসাব করলে যাকাত ফরজ হয়। সুতরাং বর্তমানে গরীবের লাভের দিক বিবেচনা করে নগদ অর্থ ও ব্যবসায়ের পন্যকে ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্যের মূল্যের সাথে মিলাতে হবে। কারো নিকট যদি ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্যের মূল্যের সমপরিমান ব্যাংকনোট জমা থাকে অথবা ব্যবসায়ের পণ্য থাকে এবং তার উপর এক বছর অতিক্রান্ত হয় তাহলে তার উপর যাকাত ফরজ হবে।[১৫]

দুই: বেশিরভাগ মুহাদ্দিসীন ও সালাফী আলেমগণ নগদ অর্থ ও ব্যবসায়ের মালের যাকাত নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্বর্ণের নিসাবকে মূল নিসাব সাব্যস্ত করেছেন। যেমন সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ (সাইয়্যেদ সালেম রচিত) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "ব্যাংক নোটকে স্বর্ণের মূল্যের সাথে মিলাবে। কারণ রৌপ্যের মূল্য বারবার পরিবর্তন হয়। ফলে অনেকেই রৌপ্যের মূল্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখতে পারেন না । অপর দিকে স্বর্ণের মূল্য রৌপ্যের মূল্যের তুলনায় বেশী সময় ধরে স্থিতিশীল থাকে। পরিবর্তন হলে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয় এবং সকলের জানা থাকে। ফলে মানুষের জন্য তার মূল্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখা সহজ হয়। তাছাড়া স্বর্ণের নেসাব যাকাতের অন্যান্য নেসাব অর্থাৎ উটের নিসাব, ছাগলের নিসাবের কাছাকাছি। কেননা এটা কিভাবে সম্ভব যে শরিয়ত যে ব্যক্তি চারটি উটের মালিক বা উনচল্লিশটি ছাগলের মালিক তার উপর যাকাত ফরজ করে নাই এবং তাকে দরিদ্র বলে আখ্যায়িত করেছে। অপরদিকে যে রূপার নিসাব পরিমান টাকার মালিক হয়েছে যার মাধ্যমে একটি ছাগল ক্রয় করাও সম্ভব

[১৫] ফিকহী মাকালাত ১/৩১।

নয় তার উপর যাকাত ফরজ করে দিয়েছে এবং তাকে ধনী বলে আখ্যায়িত করেছে।"[১৬]

উল্লেখ্য যে, স্বর্ণ খাঁটি না হলে মলিকানাধীন স্বর্ণ থেকে খাদ বাদ দিয়ে স্বর্ণের নিট ওজনকে ভিত্তি হিসাবে নেয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, ১৮ ক্যারেট স্বর্ণের ক্ষেত্রে মোট ওজনের এক চতুর্থাংশ (২৫%) বাদ দিয়ে যাকাত নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ ২৪ গ্রাম ওজনের স্বর্ণ থেকে ৬ গ্রাম বাদ যাবে। আবার ২১ ক্যারেট স্বর্ণের ক্ষেত্রে মোট ওজনের ৮ ভাগের একভাগ (১২.৫%) বাদ দিয়ে যাকাত প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ এ ধরণের ২৪ গ্রাম ওজনের স্বর্ণ থেকে ৩ গ্রাম বাদ দিতে হবে। আর ২২ ক্যারেট স্বর্ণের ক্ষেত্রে মোট ওজনের ১২ ভাগের এক ভাগ (৮.৩৩%) অর্থাৎ এ ধরণের ২৪ গ্রাম স্বর্ণের ওজন থেকে ২ গ্রাম বাদ দিয়ে খাঁটি স্বর্ণের পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে।

রৌপ্য যদি খাঁটি না হয় তাহলে রৌপ্যের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে।

স্বর্ণ, রৌপ্য এবং মুদ্রার উপর যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ: এ সকল ক্ষেত্রে যাকাতের পরিমাণ হবে এক দশমাংশের চার ভাগের এক ভাগ (শতকরা ২.৫%)।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর যাকাত নগদ অর্থে নিরূপণ: মালিকানাধীন স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর যাকাতের পরিমাণ নগদে নির্ণয়ের জন্য যাকাত বাবদ নির্ধারিত পরিমানকে গ্রাম প্রতি মূল্য দ্বারা গুন করে নিতে হবে। এ থেকে নগদে প্রদেয় যাকাতের পরিমাণ বের হয়ে আসবে। উদাহরণস্বরূপ, স্বর্ণের বাজার দর প্রতি গ্রাম ১,৬০০ টাকা হলে ৮৫ গ্রামের মূল্য ১,৩৬,০০০ টাকা যার উপর যাকাত হবে ২.৫% হারে = ৩,৪০০ টাকা। আর রূপার বাজার দর প্রতি গ্রাম ৪৭ টাকা হলে ৫৯৫ গ্রামের মূল্য ২৭,৯৬৫ টাকা যার উপর যাকাত হবে ২.৫% হারে = ৬৯৯.১৩ টাকা। যাকাত হিসাব করার সময় এসব স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিক্রয় মূল্যের (অর্থাৎ যাকাত হিসাব করার সময় বিক্রয় করতে চাইলে যে মূল্য পাওয়া যাবে) ভিত্তিতে যাকাত হিসাব করতে হবে।

[১৬] ফিকহুস সুন্নাহ ২/২০।

ব্যবহারের অলংকার এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত অন্যান্য দ্রব্যের উপর যাকাতের বিধান

সালাফে সালেহীন এবং পরবর্তী ওলামায়ে কেরামদের মাঝে এ ব্যাপারটি নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফী আলেমগণ সহ অধিকাংশ ওলামাদের নিকট ব্যবহারের অলংকার এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত অন্যান্য দ্রব্যের উপর যাকাত ফরজ। এই মতটিই দলীলের দিক থেকে শক্তিশালী এবং আমলের জন্য অধিক নিরাপদ। নিম্নে তার উপর কয়েকটি দলীল পেশ করা হলো।

(ক) পবিত্র কুরআনে স্বর্ণ ও রূপার যাকাত দেওয়ার ব্যাপারে যেই সমস্ত আয়াত এসেছে সেখানে ব্যাপকভাবে সবধরণের স্বর্ণ-রূপা বুঝানো হয়েছে। অলংকার ইত্যাদিকে বাদ দেয়া হয় নি। আয়াত:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ } [التوبة : ٣٤ ، ٣٥]

অর্থ: "যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেয়া হবে। (আর বলা হবে) 'এটা তা-ই যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর'।"[১৭]

এই আয়াতের মধ্যে ব্যাপকভাবে সব ধরণের স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর যাকাত ফরজ করা হয়েছে। চাই তা মুদ্রার আকারে হোক বা অলংকার আকারে হোক।

(খ) হাদীসের মধ্যেও ব্যাপকভাবে সবধরণের স্বর্ণ-রূপার উপর যাকাত দেওয়া আবশ্যক করা হয়েছে। হাদীস:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِىَ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ

[১৭] সুরা তাওবা ৩৪-৩৫।

لَهُ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন: যে কোন স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের মালিক তার হক আদায় করলো না (যাকাত আদায় করলো না) কেয়ামতের মাঠে তার ঐ স্বর্ণ এবং রৌপ্যকে প্লেট আকারে তৈরি করে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। অত:পর তা দিয়ে তার পাজরে, ললাটে এবং তার পিঠে দাগানো হবে। যখনই ঠান্ডা হয়ে যাবে তখনই আবার নতুন করে উত্তপ্ত করা হবে। এভাবে সারাদিন চলতে থাকবে (কেয়ামতের দিন)। যার পরিমান হবে 'পঞ্চাশ হাজার বছর'। অত:পর বিচার শেষে হয়ত তার ঠিকানা হবে জান্নাত অথবা জাহান্নাম।"[১৮]

(গ) কিছু হাদীস এমন রয়েছে যে হাদীসগুলোতে নির্দিষ্ট করে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকারের উপর যাকাত দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِى يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا « أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ». قَالَتْ لاَ. قَالَ « أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ». قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ

অর্থ: "আমর ইবনে শুয়াইব (রা:) তার পিতা এবং পিতামহের সুত্রে বর্ণনা করেন, জনৈক মহিলা তার মেয়েকে নিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা:) এর নিকটে আসলেন। তার মেয়ের হাতে দু'টি স্বর্ণের ব্রেসলেট পড়া ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা:) তাকে বললেন, তুমি এর যাকাত আদায় করেছ? মেয়েটি উত্তরে বললো, "না"। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, তোমার কাছে কি এটা পছন্দনীয় যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ (সুব:) এগুলোকে আগুনের চুরি বানিয়ে তোমার হাতে পাড়িয়ে দিক। (বর্ণনাকারী সাহাবী) বলেন, এর পর মেয়েটি

[১৮] সহীহ মুসলিম ২৩৩৭।

সেগুলো খুলে ফেললো এবং আল্লাহর রাসূল (সা:) এর নিকট দিয়ে দিল এবং বললো, এগুলো আল্লাহ এবং তার রাসূল (সা:) এর জন্য ।"[১৯]

এই হাদীসে পরিষ্কারভাবে ব্যবহারের স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকারের উপরে যাকাত আদায় করার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । একই অর্থের আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَرَأَى فِى يَدِى فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ « مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ». فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ قُلْتُ لاَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ. قَالَ « هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবনে হাদ (রা:) বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল (সা:) এর স্ত্রী আয়েশা (রা:) এর নিকটে গেলাম । তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল (সা:) আমার নিকটে এসে দেখেন আমি রূপার আংটি পরে আছি । তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি আয়েশা? উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনারই জন্য নিজেকে সজ্জিত করতে এগুলো তৈরী করেছি । তিনি বললেন, তুমি কি এগুলোর যাকাত আদায় করেছ? আমি বললাম, "না" অথবা বললেন, "মাশাআল্লাহ" অর্থাৎ "আল্লাহ যেমনটা চেয়েছেন তেমনটাই হয়েছে" । রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, তোমার জাহান্নামে যাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট । ।[২০]

তাছাড়া শরিয়তের দৃষ্টিতে যেই সম্পদের মধ্যেই বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষমতা থাকবে তার মধ্যেই যাকাত ফরজ হবে । আর স্বর্ণ-রূপার মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই বর্ধণ-ক্ষমতা (ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষমতা) রয়েছে । তাই তার উপর যাকাত ফরজ হবে । কিন্তু পরিধানের কাপড়-চোপড় এর ব্যতিক্রম । ব্যবহারের স্বর্ণালংকারকে ব্যবহারের কাপড়-চোপড়, থালা-বাসন ইত্যাদির সাথে তুলনা করা যাবে না । কেননা তার মধ্যে বর্ধণ-ক্ষমতা নাই । না প্রকৃতিগতভাবে না কার্যগতভাবে ।

---

[১৯] আবু দাউদ ১৫৬৫ । হাদীসটি হাসান পর্যায়ের তবে একই অর্থের অনেক হাদীস থাকার কারণে তা সহীহ হাদীসের পর্যায়ের ।

[২০] সুনানে আবু দাউদ ১৫৬৭ । হাদীসটি সহীহ ।

স্বর্ণ-রূপার অলংকার পরিমাপ করার সময় অলংকারের মধ্যে যেই খাদ, পাথর বা অন্যান্য ধাতু থাকবে তা বাদ দিয়ে নিট পরিমাণ স্বর্ণ-রূপার যাকাত দিতে হবে । যাকাতের পরিমাণ হল ২.৫% ।

যেসব স্বর্ণ-রূপা নিষিদ্ধ (যেমন: পুরুষের ব্যবহার করার জন্য নির্মিত স্বর্ণ বা রূপার অলংকার) সেগুলোর উপর সকলের সর্বসম্মতিক্রমে যাকাত ফরজ । যদি তার মূল্য স্বতন্ত্রভাবে বা অন্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে মিলালে নিসাব পরিমান হয়ে যায় তাহলে তার থেকে ২.৫% হারে যাকাত আদায় করতে হবে ।

সিকিউরিটির উপর যাকাত

সিকিউরিটি হচ্ছে (যেমন: ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার, বন্ড, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি) ইস্যুকারী কোম্পানি বা সংস্থার দেনা (ঋণ) নির্দেশক । কোম্পানির লাভ বা লোকসান যাই হোক না কেন সিকিউরিটির উপর নির্দিষ্টহারে সুদ প্রদান করতে হয় । কোম্পানি নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে সিকিউরিটির মূল্য ফেরত দানে বাধ্য । সিকিউরিটির একটা নামিক মূল্য (Normal Value) এবং একটা বাজার মূল্য থাকে । নামিক মূল্য কোম্পানি/সংস্থা নিজেই নির্ধারণ করে দেয় । এটাই সিকিউরিটির প্রকৃত মূল্য । কিন্তু সিকিউরিটির বাজার মূল্য এর চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ণীত হয় ।

সিকিউরিটি ব্যবসা সুদের কারবারের সমপর্যায়ভুক্ত বলে এটা নিষিদ্ধ । সিকিউরিটির ক্রয়-বিক্রয় মূলত: সুদের কারবার একজন অন্যজনের নিকট হস্তান্তরের শামিল । এ জন্য এটা অবৈধ । তবে উল্লেখ্য যে, সিকিউরিটির ব্যবসা অবৈধ হলেও তার উপর যাকাত প্রদান করতে হবে ।

সিকিউরিটির উপর যাকাত প্রদানের নিয়ম হলো: সিকিউরিটির নামিক মূল্য অন্যান্য সম্পদের মূল্যের সাথে যোগ করলে যদি যোগফল নিসাব পরিমান পর্যায়ে পৌঁছে তা হলে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার উপর যাকাত প্রদান করতে হবে । যাকাতের পরিমান হবে ২.৫% হারে । তবে উল্লেখ্য যে, সিকিউরিটি বাবদ অর্জিত সুদের উপর যাকাত আবশ্যক হবে না । এবং তা পুরোটাই সওয়াবের উদ্দেশ্য ব্যতিত কোন জনহিতকর কাজে ব্যয় করতে হবে, তবে এরূপ অর্থ কোনক্রমেই মসজিদ নিমার্ণ বা পবিত্র কুরআন মুদ্রণের কাজে ব্যয় করা যাবে না । এবং জনহিতকর কাজে ব্যয় করা এই অর্থকে কোনক্রমেই যাকাত বলা যাবে না ।

শেয়ারের উপর যাকাত

কোম্পানি নিজেই যদি শেয়ারের উপর যাকাত প্রদান করে হা হলে শেয়ারমালিককে তার মালিকানাধীন শেয়ারের উপর যাকাত দিতে হবে না। কারণ একই সম্পদের দুইবার যাকাত হয় না।

কোম্পানি নিজে তার শেয়ারের উপর যাকাত প্রদান না করলে শেয়ার মালিককে নিম্নোক্ত উপায়ে যাকাত প্রদান করতে হবে।

-শেয়ার মালিক যদি শেয়ারগুলো ব্যবসায়িক সুবিধা অর্জনের (অর্থাৎ শেয়ার বেচাকেনার ব্যবসা করে) জন্য ব্যবহার করে তা হলে যেদিন যাকাত প্রদেয় হবে, শেয়ারের সেদিনের বাজার মূল্যের ২.৫% হারে যাকাত নির্ণীত হবে।

-কিন্তু শেয়ারগুলো যদি বার্ষিক মুনাফা অর্জনের কাজে বিনিয়োগ করা হয়, তা হলে যাকাতের পরিমাণ নিম্নোক্ত উপায়ে নির্ণয় করা হবেঃ

(ক) শেয়ার মলিক যদি কোম্পানির হিসাবপত্র যাচাই করার সুযোগ পায় এবং তার মালিকানাধীন শেয়ারের বিপরীতে যাকাতযোগ্য সম্পদের পরিমাণ জানতে পারে, তাহলে তিনি এক দশমাংশের চারভাগের এক ভাগ (২.৫%) যাকাত প্রদান করবেন।

(খ) কোম্পানির হিসাবপত্র সম্পর্কে যদি তার কোন ধারণা না থাকে তাহলে তিনি তার মালিকানাধী শেয়ারের উপর বার্ষিক অর্জিত মুনাফা যাকাতের জন্য বিবেচ্য অন্যান্য সম্পত্তির মূল্যের সঙ্গে যোগ করবেন এবং মোট মূল্য নিসাব পর্যায়ে পৌঁছার পর বৎসরান্তে ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করবেন।

বৈদেশিক মুদ্রার উপর যাকাত হিসাব

যাকাত প্রদানের সময় যদি যাকাত প্রদানকারী বৈদেশিক মুদ্রারও মালিক থাকে তাহলে সেগুলোরও যাকাত আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে সকল বৈদেশিক মুদ্রার নগদ, ব্যাংকে জমা, টিসি, বন্ড, সিকিউরিটি ইত্যাদি যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তির বসবাসের দেশের মুদ্রাবাজারে বিদ্যমান বিনিময় হারে মূল্য নির্ধারণ করে অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে যোগ করে যাকাত প্রদান করতে হবে।

দাপ্তরিক কাজ ও অন্যান্য পেশা থেকে অর্জিত আয়ের উপর যাকাত

উপার্জিত সব কিছুই আয় বলে গণ্য হয়। যদি কোন ব্যক্তি যাকাতের জন্য বিবেচিত সম্পদ ছাড়াও পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়ার আগেই অন্য

কোন উৎস থেকে আয় উপার্জনের মালিক হয় (যেমন ব্যবসা থেকে আর্থিক মুনাফা বা গবাদি পশুর বাচ্চা জন্মদান) তাহলে ঐ অর্জিত সম্পদ তার বর্তমান সম্পদের সাথে যোগ করতে হবে। **আবু হানিফার (রঃ) মতে,** পূর্ণ এক বছর কেটে যাওয়ার পর উভয় ধরণের সম্পদের উপরই যাকাত প্রদান করতে হবে, তবে সম্প্রতি অর্জিত সম্পত্তি আগে থেকে বিদ্যমান সম্পত্তির ফল কিনা তা এক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়। নতুন অর্জিত সম্পদ যদি পূর্ব থেকে বিদ্যমান সম্পত্তি থেকে ভিন্ন প্রকৃতির (যেমন নগদ অর্থের মালিক এক ব্যক্তি নতুন করে গবাদি পশু সম্পদ অর্জন করেন) হয়, তা হলে নতুন অর্জিত সম্পদ পূর্ব থেকে বিদ্যমান সম্পদের সাথে যোগ করা হবে না। বরং এটাকে একটা পৃথক সম্পদ বলে গণ্য করে ভিন্ন প্রক্রিয়ায় হিসাব করে যাকাত নির্ধারণ করে মেয়াদান্তে যাকাত প্রদান করতে হবে।

কোন শ্রমিক-কর্মচারী তার মজুরি বা বেতন থেকে সঞ্চয় করলে সঞ্চিত অর্থ তার মালিকানাধীন অর্থের সাথে যোগ করা হবে এবং নিসাব স্তরে পৌঁছে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর মোট যোগফলের উপর যাকাত প্রদান করতে হবে।

অগ্রিম যাকাত প্রদান করা

উত্তরঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার সম্ভাব্য সঞ্চয় (যা তিনি সুপরিকল্পিতভাবে সঞ্চয় করতে আগ্রহী) নির্ধারণ করে তার উপর অগ্রিম যাকাত প্রদান করতে পারেন। অতএব, বছর শেষে প্রকৃত সঞ্চয় হিসাব করে অন্যান্য সম্পদের সাথে যোগ করে বকেয়া যাকাত পরিশোধ করতে পারেন। তবে অগ্রিম প্রদত্ত পরিমাণ যদি নির্ণীত যাকাত হতে বেশী হয় তবে তা স্বেচ্ছা দান বলে গণ্য হবে।

চাকুরীজীবির ভবিষ্যত তহবিল (Employees Provident Fund) এর উপর যাকাত

কোন কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের রীতি অনুযায়ী ভবিষ্যত তহবিলের সুবিধা থাকে। চাকুরীজীবির মজুরী বা বেতন থেকে মূল বেতনের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ কর্তণ করে চাকুরীজীবির চাঁদা বাবদ এই তহবিলের হিসাবে জমা করা হয় । কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ডের বেলায় নিয়োগকর্তা সমপরিমাণ অর্থ উক্ত তহবিলে চাঁদা বাবদ জমা করে । চাকুরীজীবির অবসর গ্রহন, ছাঁটাই, ডিসচার্জ, বরখাস্ত, অপসারণ বা চাকুরী পরিত্যাগ

কালে এই অর্থ (বিধি অনুযায়ী মালিকের চাঁদা সুবিধা প্রাপ্ত হলে তা সহ) ফেরত দেয়া হয় ।

প্রতিষ্ঠানের রীতি অনুযায়ী বাধ্যতামুলকভাবে (Compulsorily) চাকুরীজীবির বেতনের একটি অংশ নির্দ্দিষ্ট হারে কর্তণ করে ভবিষ্যত তহবিলে জমা করা হলে ঐ অর্থের উপর যাকাত ধার্য হবে না, কারণ ঐ অর্থের উপর চাকুরীজীবির কোন নিয়ন্ত্রন থাকে না (আজমগড়ে অনুষ্ঠিত ইসলামিক ফিকাহ্ একাডেমী, ভারত এর পঞ্চম সেমিনারে প্রদত্ত ফতওয়া)। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভবিষ্য তহবিলের অর্থ ফেরৎ পাওয়ার পর যাকাতের আওতাভুক্ত হবে। ঐচ্ছিকভাবে বা সেচ্ছায় (Optional or voluntarily) ভবিষ্য তহবিলে বেতনের একটা অংশ জমা করা হলে তার উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে অথবা বাধ্যতামুলক হারের চাইতে বেশী হারে এই তহবিলে বেতনের একটা অংশ জমা করা হলে ঐ অতিরিক্ত জমা অর্থের উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে। চাকুরীজীবির অন্যান্য সম্পদের সাথে এই অর্থ যোগ হয়ে নিসাব পূর্ণ হলে যাকাত প্রদান করতে হবে।

কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান যদি এই তহবিলের অর্থ কোন বৈধ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে এবং তা থেকে প্রাপ্ত মুনাফা তহবিলের সদস্যদের মধ্যে আনুপাতিক হারে বন্টন করে, তাহলে মুনাফা সহ মোট জমাকৃত অর্থের উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে। আর যদি কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান তহবিলের অর্থের উপর সুদ প্রদান করে বা কোন সুদী ব্যাংকে জমা রাখে অথবা সুদভিত্তিক সিকিউরিটি ক্রয় করে উহার উপর প্রাপ্ত সুদ তহবিলের সদস্যদের মাঝে বন্টন করে, তবে উক্ত সুদের উপর যাকাত ধার্য হবে না। প্রাপ্ত সমস্ত সুদ অবৈধ উপার্জন বিধায় কোন জনহিতকর কাজে ব্যয় করে দিতে হবে ।এই অর্থ নিজের বা পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যয় করা যাবে না। এইক্ষেত্রে চাকুরীজীবি ভবিষ্যত তহবিলের হিসাবে প্রদত্ত প্রকৃত জমাকৃত অর্থের যাকাত প্রদান করবেন।

জীবন বীমার প্রিমিয়াম বাবদ জমাকৃত অর্থের উপর যাকাত

ভবিষ্যত জীবনের অনিশ্চয়তার ঝুঁকি যেমন আকস্মিক দুর্ঘটনা, বিপদ বা ক্ষতি যেন একজন মানুষকে সম্পুর্ণভাবে ধ্বংস করে না দেয় এই উদ্দেশ্যেই ভবিষ্যতে আর্থিক নিরাপত্তা গড়ে তোলার জন্য কিছু লোক নিয়মিত কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (প্রিমিয়াম) জমা দিয়ে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য

বীমা কোম্পানির সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়। এই চুক্তিকে বীমা পলিসি (Insurance Policy) বলে। বীমা পলিসিতে বীমাকৃত অর্থের পরিমাণ, সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ (Risks), বীমার মেয়াদকাল, প্রদেয় কিস্তির পরিমাণ ইত্যাদির উল্লেখ থাকে।

ঘটনাক্রমে বীমাগ্রহীতার কোন দুর্ঘটনা, বিপদ বা মৃত্যু ঘটলে চুক্তি অনুযায়ী বীমাকৃত পরিমাণ অর্থ বীমা কোম্পানি পরিশোধ করে, যা প্রিমিয়াম বাবদ জমাকৃত মূল অর্থের থেকে বেশী। অথবা কোন দুর্ঘটনা ঘটা ছাড়াই বীমার মেয়াদ পূর্ণ হলে, বীমা কোম্পানি প্রিমিয়াম বাবদ জমাকৃত প্রকৃত অর্থের সাথে আরও কিছু অতিরিক্ত অর্থ বীমাগ্রহীতাকে প্রদান করে।

বীমা কোম্পানি তাদের বীমাগ্রহীতাদের কাছ থেকে প্রিমিয়াম হিসাবে জমাকৃত প্রাপ্ত অর্থ সুদভিত্তিক সিকিউরিটি অথবা সুদী ব্যাংকে জমা রেখে তার উপর সুদ অর্জন করে এবং প্রাপ্ত সুদ বীমার দাবী পরিশোধ ও অতিরিক্ত অর্থ বাবদ প্রদান করে। প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা সুদভিত্তিক বলে গণ্য করা হয়। এগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। তবে বীমাগ্রহীতা অবশ্যই প্রিমিয়াম বাবদ প্রদত্ত জমাকৃত মূল অর্থ তার অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে যোগ করে নিসাব পূ৭র্ণ হলে বৎসরান্তে যাকাত প্রদান করবেন। বীমার অর্থ ফেরৎ পাওয়ার পর মূল (প্রিমিয়াম বাবদ প্রদত্ত) অর্থ বীমাগ্রহীতা বা তার উত্তরাধিকারীগণ ভোগ করবেন। অতিরিক্ত প্রাপ্ত অর্থ সুদের অর্থের ন্যায় জনহিতকর কাজে ব্যয় করে দিতে হবে, এই অর্থ নিজের বা পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যয় করা যাবে না।

অবৈধ উপায়ে পাওয়া অর্থের উপর যাকাত

১) ইসলামী বিধানে নিষিদ্ধ পথে অর্জিত বা বিনিয়োগকৃত সম্পদকে অবৈধ সম্পদ বলে। সম্পদটি নিষিদ্ধ (হারাম) হওয়ার একাধিক কারণ থাকতে পারে। প্রথমত: দ্রব্যটি মানুষের জন্য ক্ষতিকর হওয়ার কারণে। যেমন- মৃত জন্তুর গোশ্ত বা পঁচা গোশ্ত, মাদক দ্রব্য বা শূকুরের মাংস। দ্বিতীয়তঃ দ্রব্যটি অবৈধ উপায়ে অর্জিত হওয়ার কারণে। যেমনঃ ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, সুদ বা উৎকোচের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ অবৈধ।

২) ক) অবৈধ উপায়ে সম্পত্তি অর্জন বা সম্পত্তির মালিকানা লাভের কোন স্বীকৃত পন্থায় সম্পত্তি অর্জণ না করা হলে। এক্ষেত্রে অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জনকারীকে সম্পদটি তার প্রকৃত মালিককে অথবা তার অবর্তমানে

(মৃত্যুতে) তার উত্তরাধিকারীদের ফিরিয়ে দিতে হবে। প্রকৃত বা বৈধ মালিককে চিহ্নিত করা সম্ভব না হলে জনহিতকর কাজে তা দান করতে হবে। এটা প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে দান বলে গণ্য হবে এবং পুরস্কার (সাওয়াব) তারই প্রাপ্য হবে।

খ) নিষিদ্ধ বা অবৈধ কাজ সম্পাদনের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ জনহিতকর কাজে দান করতে হবে। কিন্তু এর প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেয়া যাবে না।

গ) অবৈধ উপায়ে প্রাপ্ত সম্পদটি যদি ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব না হয়, তা হলে সমজাতীয় অথবা সমমূল্যের কোন দ্রব্য প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে। প্রকৃত মালিককে চিহ্নিত করা সম্ভব না হলে সম্পদটি কোন জনহিতকর কাজে দান করতে হবে। এটা প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে একটা দান বলে গণ্য হবে এবং পুরস্কার (সওয়াব) তারই উপর বর্তাবে।

৩) নৈতিক স্খলনের (যেমনঃ পতিতাবৃত্তি) মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি অবৈধ বিধায় যাকাতের জন্য গণনা করা হবে না। কারণ ইসলামী বিধানের দিক থেকে এটা মূল্যহীন। শরিয়াহ নির্দেশিত পথে এর বিলিবন্টনের ব্যবস্থা করা উচিত ।

৪) অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পত্তির উপর অবৈধ দখলদারের প্রকৃত মালিকানা না থাকার জন্যই তা যাকাতের জন্য বিবেচিত হয় না। সম্পদটি এর প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেয়া হলে, ঐ সম্পদটি মাত্র এক বছরের জন্য যাকাতের জন্য বিবেচিত হবে । এটাই এ ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

৫) অবৈধ উপায়ে দখলকৃত সম্পত্তি প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত না দেয়া পর্যন্ত এর উপর যাকাত প্রদান অর্থহীন। কাজেই অবৈধ মালিকের উচিত সম্পদটি এর প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেয়া, যদি সে তাকে জানে। প্রকৃত মালিককে চিহ্নিত করা সম্ভব না হলে সম্পদটি কোন জনহিতকর কাজে প্রকৃত মালিকের পক্ষে দান করতে হবে ।

ঋণ ও যাকাত

একজন অপরজনের কাছ থেকে কোন পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ফেরত দেওয়ার অঙ্গীকারে গ্রহণ করলে তাকে ঋণ বলে।

ঋণদাতার উপর যাকাত

(ক) আদায়যোগ্য ঋণের উপর ঋণদাতাকে যাকাত দিতে হবে।

(খ) আদায় অযোগ্য বা আদায় হবার ব্যাপারে সন্দেহ থাকলে সে ঋণ যাকাতের হিসাবে আসবে না। যদি কখনও উক্ত ঋণের টাকা আদায় হয়, তবে কেবলমাত্র ১ (এক) বৎসরের জন্য উহার যাকাত দিতে হবে, যত বৎসর পর সেই ঋণ ফেরত পাওয়া যাক না কেন।

ঋণগ্রহীতার উপর যাকাত

(ক) ঋণগ্রহীতার ঋণের টাকা মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে। কিন্তু যদি ঋণগ্রহীতার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থায়ী সম্পত্তি (যেমন- অতিরিক্ত বাড়ী, দালান, জমি, এপার্টমেন্ট, মেশিনারী, যানবাহন, গাড়ী ও আসবাবপত্র ইত্যাদি) থাকে যা দ্বারা সে এরূপ ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম, তবে উক্ত ঋণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে না।

(খ) স্থায়ী সম্পদের উপর কিস্তিভিত্তিক ঋণ (যেমন- হাউজিং লোন ইত্যাদি) যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে না। তবে বার্ষিক কিস্তির টাকা অপরিশোধিত থাকলে তা যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে।

(গ) ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য ঋণ নেওয়া হলে উক্ত ঋণের টাকা যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে। কিন্তু যদি ঋণগ্রহিতার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থায়ী সম্পত্তি থাকে যা দ্বারা উক্ত ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম তবে উক্ত ঋণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে না।

(ঘ) শিল্প-বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঋণের টাকা যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে। তবে যদি ঋণগ্রহিতার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থায়ী সম্পদ থেকে উক্ত ঋণ পরিশোধ করা যায় তবে যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে না।

(চ) যদি অতিরিক্ত স্থায়ী সম্পত্তির মূল্য ঋণের পরিমাণের চেয়ে কম হয়, তবে ঋণের পরিমাণ থেকে তা বাদ দিয়ে বাকী ঋণের টাকা যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে । বিলম্বে প্রদেয় বিনিয়োগ ঋণের বেলায় শুধুমাত্র ঋণের বার্ষিক অপরিশোধিত কিস্তি যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে ।

দ্বিতীয় প্রকারের বিস্তারিত বিবরণঃ ব্যবসায়িক পণ্যের উপর যাকাত

স্বর্ণ-রৌপ্য এবং যেই সব গবাদি পশুর উপর শরিয়ত কর্তৃক যাকাত নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে সেগুলো ব্যতিত ব্যবসায়ের প্রয়োজনে বা উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন সকল পণ্যকে বানিজ্যিক পণ্য বলে।

পণ্যের মালিকানা দেশের অভ্যন্তরীন বাজার থেকে ক্রয় অথবা বিদেশ থেকে আমদানির মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। যেহেতু স্বর্ণ-রৌপ্য এবং গবাদি পশুর উপর শরিয়ত মৌলিকভাবে যাকাত নির্ধারণ করে দিয়েছে তাই তার উপর সেই মৌলিক নিসাবের হিসাবেই যাকাত ফরজ হবে। ব্যবসায়িক পণ্য হিসাবে নয়। তবে যদি ব্যবসায়িক স্বর্ণ-রৌপ্য ও গবাদি পশুর পরিমান উহার যাকাতের জন্য নির্ধারিত নিসাবের চেয়ে কম হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক পণ্য হিসাবেই যাকাত আদায় করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ভূ-সম্পতি (যেমনঃ জমি বেচা-কেনা, প্লট ব্যবসা), দালান-কোঠা (ফ্লাট ব্যবসা), খাদ্য সামগ্রী ও কৃষি-পণ্য ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ে নিয়োজিত হলে ব্যবসায়িক সম্পদের আওতাভুক্ত হবে। এক বা একাধিক ব্যক্তির মালিকানাধীন দোকানে রাখা পণ্যদ্রব্যও এর মধ্যে পড়ে।

মূলধনী দ্রব্য ও বানিজ্যিক পণ্যের মধ্যে পার্থক্য

হিসাব বিজ্ঞানে মূলধনী দ্রব্য বলতে স্থায়ী সম্পত্তিকে (Fixed Asset) বুঝায়। এগুলো প্রতিষ্ঠানকে চালিয়ে নেয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়, ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয়। সাধারণতঃ উৎপাদন কার্য চালিয়ে নেয়ার জন্যই মূলধনী দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ কারখানা, দালান-কোঠা, কলকব্জা, যানবাহন, ডেস্ক, আসবাবপত্র, গুদাম, পণ্যদ্রব্য সাজিয়ে রাখার জন্য র‍্যাক বা তাক ইত্যাদি মূলধনী দ্রব্য বলে গণ্য হবে। যাকাত নির্ধারণের জন্য এসব দ্রব্য বিবেচনায় নেয়া হবে না।

ব্যবসায়িক পণ্যগুলোকে হিসাববিজ্ঞানের ভাষায় চলতি সম্পত্তি (Current or circulating Asset) বলে গণ্য করা হয়। পণ্য উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সংগৃহীত কাঁচামাল, পণ্যদ্রব্য, মেশিনারী, যানবাহন, জমি, ভূ-সম্পত্তি, দালান-কোঠা ইত্যাদি এ পর্যায়ভূক্ত। যাকাতের অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে এগুলো যাকাতের জন্য বিবেচিত হয়।|

ব্যবসায়িক পণ্যের উপর যাকাত প্রদানের শর্ত

ব্যবসায়িক পণ্যের উপর যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য শর্তসমূহ নিম্নরূপঃ

১। কোন কিছুর বিনিময়ে পণ্যের মালিকানা অর্জন

পণ্যটি অবশ্যই নগদ অর্থ বা অন্য কোন পণ্যের বিনিময়ে অথবা বাকিতে ক্রয় করতে হবে। কোন মহিলা কর্তৃক মহর বাবদ প্রাপ্ত দ্রব্য কিংবা তালাকের ক্ষেত্রে স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষ বাবদ প্রাপ্ত সম্পদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য (যদি এই সম্পত্তি দ্বারা ব্যবসার নিয়ত করে থাকে)।

যাহোক, উত্তরাধিকার বা দান সূত্রে মালিকানা প্রাপ্ত সম্পত্তি, বিক্রিত মাল ক্রটিযুক্ত হওয়ার কারণে বিক্রেতার কাছে ফেরত আসা ইত্যাদি সম্পত্তি ব্যবসায়িক সম্পত্তি বলেই গণ্য হবে এবং এর উপর নির্ধারিত পদ্ধতিতেই যাকাত ফরজ হবে (যদি এই সম্পত্তি দ্বারা ব্যবসার নিয়ত করে থাকে)।

২। নিয়্যত

সম্পদ বা পণ্য ক্রয়ের সময় বিক্রেতার মনে পণ্যটি ব্যবসায়িক প্রয়োজনের আগ্রহ (নিয়ত) থাকতে হবে। এ উদ্দেশ্য দ্বারাই নির্ণীত হবে সম্পত্তিটি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য না ব্যবসায়িক প্রয়োজনে অর্জিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি গাড়ি প্রথমে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যই কেনা হয়েছিল এবং পরবর্তী কালে ঠিক হল যে, লাভজনক দাম পাওয়া গেলে গাড়িটি বিক্রি করে দেয়া হবে। এক্ষেত্রে গাড়িটি ব্যবসায়িক পণ্য বলে গণ্য হবে না এবং যাকাতের জন্যও বিবেচিত হবে না। কিন্তু কোন ব্যবসায়ী বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কতিপয় গাড়ি ক্রয় করে একটি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য রেখে দিলে ক্রয়ের মূল উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে এটিও যাকাতের জন্য বিবেচিত হবে।

ব্যবসায়িক সম্পদের উপর যাকাত কিভাবে প্রদান করা হবে

যাকাত যে সময় আদায় করা হবে সে সময় বানিজ্যিক সম্পদের মালিক তার মালিকানাধীন বানিজ্যিক সম্পদ ও পণ্যের মোট পরিমাণ ও প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করবেন। মজুদ পণ্যের মূল্য, হাতে থাকা নগদ টাকা ও আদায়যোগ্য পাওনা টাকার সমষ্টিই যাকাতযোগ্য মোট বানিজ্যিক সম্পদ বলে গণ্য হবে। বাণিজ্যিক সম্পদের এই মূল্য থেকে ব্যবসায়িক দেনা বাদ দিয়ে ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করতে হবে।

বানিজ্যিক সম্পদের যাকাতের পরিমাণ হিসাবের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সূত্রটি বিবেচিত হতে পারেঃ হাতে থাকা নগদ অর্থ এবং মজুদ মালের বিক্রয়

মূল্য ও আদায়যোগ্য মোট পাওনা একত্র করে তার থেকে এ বছর যে পরিমান ঋণ পরিশোষ করতে হবে তা বাদ দিয়ে যে পরিমান সম্পদ থাকবে তার থেকে ২.৫% যাকাত দিতে হবে।

ব্যবসায়িক সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করা

উত্তর: যাকাত প্রদানের জন্য ব্যবসায়িক সম্পদের মূল্য হিসাবরক্ষণের গতানুগতিক নিম্নতম মূল্যের ভিত্তিতে নির্ণীত হবে না। যাকাত ধার্য হওয়ার সময়ে বাজারে বিদ্যমান মূল্যের আলোকে ব্যবসায়িক সম্পদের মূল্য নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে বাজারমূল্য ক্রয়মূল্যের চেয়ে কম না বেশি তা বিবেচ্য নয়।

বানিজ্যিক পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে জেদ্দার ইসলামী আইন বিষয়ক (ফিকাহ্) একাডেমি এই মত পোষণ করেন যে, বানিজ্যিক পণ্যের মূল্য পাইকারি বাজারে বিদ্যমান মূল্যের ভিত্তিতে নির্ণীত হবে, এমনকি পণ্যগুলি খুচরা বাজারে বিক্রয় করার জন্য নিয়োজিত হলেও।

ব্যবসায়িক পণ্যের উপর যাকাত কি নগদ টাকার মাধ্যমে আদায় করতে হবে

মৌলিক দিক থেকে বিবেচনা করলে ব্যবসায়িক পণ্যের উপর যাকাত অবশ্যই নগদ টাকায় প্রদান করতে হবে। কেননা গরীব লোকদের কাছে নগদ টাকাই অধিকতর কল্যাণকর। কারণ নগদ অর্থের দ্বারা যে কোন প্রয়োজন মিটানো যায়। তবে কষ্টকর পরিস্থিতি এড়াবার জন্য কোন ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ের পণ্য থেকেও যাকাত দিতে পারে।

ব্যবসায়ি ব্যক্তি অন্যদের কাছে পাওনা টাকার যাকাত কিভাবে আদায় করবে

ব্যবসায়ি ব্যক্তি অন্যদের কাছে যেই টাকা পাবে তা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা:

ক) আদায়যোগ্য পাওনা

যে দেনা দেনাদার কর্তৃক স্বীকৃত এবং দেনাদার তা পরিশোধে সক্ষম কিংবা যদি দেনা পরিশোধে দেনাদার অস্বীকৃতি জানায়, কিন্তু তার বিপরীতে

দেনার বৈধ প্রমাণ রয়েছে এবং আদালতে অভিযুক্ত হলে দেনা পরিশোধে বাধ্য হবে, তাকে আদায়যোগ্য পাওনা বলে। আদায়যোগ্য পাওনাকে উত্তম পাওনা বলে। আদায়যোগ্য পাওনা মোট সম্পত্তির সঙ্গে যোগ করে যাকাতের আওতাধীন সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে।

খ) আদায়ের অযোগ্য পাওনা

দেনাদার যদি দেউলিয়া হয়ে যায়, কিংবা দেনা পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়, কিংবা দেনার সমর্থনে কোন বৈধ প্রমানপত্র না থাকে কিংবা দেনা স্বীকার করলেও দেনা প্রদানে অহেতুক গড়িমসি করে তাহলে ঐ দেনাকে আদায়ের অযোগ্য পাওনা বলা হয়। এ ধরণের সন্দেহজনক পাওনা কার্যত: আদায় না হওয়া পর্যন্ত যাকাতের আওতাধীন বলে গণ্য হয় না। এ জাতীয় পাওনা আদায় হবার পর মাত্র এক বছরের যাকাত আদায় করতে হবে, কত বছর ধরে তা পাওনার খাতায় লিপিবদ্ধ ছিল তা এক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়। এটি অধিকাংশ ওলামাদের মত। তবে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এধরণের পাওনা আদায় হওয়ার পর বিগত যে কয়টি বছরের যাকাত দেয়া হয় নাই তার যাকাতসহ আদায় করতে হবে।

শিল্পক্ষেত্রে যাকাত

অন্যান্য কাজের তুলনায় ব্যবসায়িক কাজের সাথে শিল্প-কর্মের সামঞ্জস্য অনেক বেশি। শিল্প-কর্মকে ব্যবসা থেকে আলাদা করে দেখার উপায় নাই। বরং কাঁচামাল ক্রয় করা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পণ্য উৎপাদনের পর এগুলোকে বিক্রয়ের মধ্যেই শিল্পকর্ম সীমাবদ্ধ। কাজেই ব্যবসায়িক পণ্যের উপর প্রযোজ্য যাকাতের সকল বিধানই শিল্প-কর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অপরের কল্যাণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের (উদাহরণ স্বরূপ: লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানি, স্বর্ণকার, সুতার, বস্ত্র কারখানা) উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ব্যবসায়িক পণ্য বলে গণ্য হবে না। কিন্তু যদি এসব উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানে (শিল্প) কাঁচামাল ক্রয় করে নিজেদের সুবিধার্থে এগুলোর প্রকৃতিগত পরিবর্তন সাধন করে বিক্রি করে তাহলে এসব পণ্য ব্যবসায়িক পণ্য বলে বিবেচিত হবে এবং উৎপাদন ব্যয় বাদ দেয়ার পর তা যাকাতের জন্য গণনা করতে হবে।

শিল্পকর্ম দুই ধরণের হতে পারে - প্রথম ধরণ: ব্যবসায় বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে উৎপাদিত বা তৈরি পণ্য ক্রয় এ পর্যায়ে পড়ে। এসব পণ্যের মূল্য বাজার দরের ভিত্তিতে নির্ণীত হয়। অত:পর এগুলোর মূল্য নগদ অর্থ ও আদায়যোগ্য পাওনার সাথে যোগ করে এবং নিজস্ব দেনা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পত্তির উপর যাকাত ধার্য করা হয়।

দ্বিতীয় ধরণ: যাকাত প্রদানকারী কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যাদি এ পর্যায়ে পড়ে। এক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের প্রধান উপকরণ অর্থাৎ কাঁচামাল এবং প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত অন্যান্য মালামাল হিসাব করে যাকাত ধার্য করা হয়। যাহোক, উপরোক্ত উভয় ক্ষেত্রে ২.৫% হারে যাকাত পরিশোধ করতে হবে।

তৃতীয় প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ: শস্য ও ফলমূলের উপর যাকাত

শস্য ও ফলমূলের উপর যাকাতের বিধান সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

যাকাতের জন্য বিবেচ্য ফল ও অন্যান্য শস্য

ইমাম আবু হানিফা (র:) ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতে, বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত আবাদী জমি থেকে উৎপন্ন সকল শস্য ও ফলের উপর যাকাত আদায় করতে হবে। কুরআনের একটি আয়াতে বলা আছে:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: ٢٦٧]

অর্থ: "হে মুমিনগন! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তম্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর; এবং এর নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না।"[২১]

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন:

عَنْ عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

[২১] সুরা বাকারা ২৬৭।

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন- বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানির সাহায্যে পরিচালিত সেচ কার্য কিংবা ভূ-গর্ভস্থপানি (মূলের সাহায্যে আহরিত) দ্বারা চালিত চাষাবাদের ক্ষেত্রে যাকাতের পরিমাণ হবে এক-দশমাংশ এবং যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরিচালিত সেচকার্যের ক্ষেত্রে যাকাতের পরিমাণ হবে এক-দশমাংশের অর্ধেক।"[২২]

যাহোক, মনুষ্য পরিশ্রম ছাড়াই জন্মে এমন সব উদ্ভিদ যেমন বনজ বৃক্ষ, ঘাস, নলখাগড়া ইত্যাদি যাকাতের জন্য গণনা করা হবে না, যদি না সেগুলি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা হয়।

কৃষি-পণ্যের উপর যাকাত

কৃষি-পণ্য বেচা-কেনা করা হলে তা ব্যবসায়িক পণ্য বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যবসায়িক পণ্যের হারে তাতে যাকাত ধার্য্য করা হবে।

যাকাতের জন্য বিবেচ্য শস্য ও ফলের পরিমাণ (নিসাব)

বিশুদ্ধ হাদীস অনুযায়ী, "পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ (শস্য ও ফল) যাকাতের জন্য গণনা করা হয় না।" হাদীসটি হলো:

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

অর্থ: "আবূ সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, 'পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমান (শস্য ও ফল) যাকাতের জন্য গণনা করা হয় না।"[২৩]

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানিফা (র:) এবং পরবর্তীযুগের হানাফী আলেমগণের মতে "ভূমি থেকে যাই উৎপন্ন হোক, কম হোক বা বেশী হোক, তার যাকাত দিতে হবে.... ।"

পাঁচ ওয়াসাক বর্তমান সময়ের ৬৫৩ কিলোগ্রাম বা ১৭ মণ গম বা অন্যান্য শস্যের সমান। শুষ্ক খাদ্যের শুকানো প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর নিসাব নির্ধারণ করতে হবে, আগে নয়। এটা ইমাম আবু ইউসূফ, মালিক,

[২২] সহীহ বুখারী ১৪৮৩; সুনানে তিরমিজী ৬৩৫।

[২৩] সহীহ বুখারী ১৪৪৭; সহীহ মুসলিম ২৩১০; সুনানে আবূ দাউদ ১৫৬০; সুনানে নাসায়ী ২৪৪৪; সুনানে ইবনে মাজাহ ১৭৯৪।

শাফি'য়ী ও আহমদের (রঃ) এর মতে। (এই মতের উপর আমল করা উচিত)
তবে ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর মতে পাঁচ ওয়াসাক হচ্ছে ৯৯০ কিলোগ্রাম বা ২৫ মণ গম বা অন্যান্য শস্যের সমান।

শস্য ও ফলের উপর যাকাত কখন আদায় করতে হবে

অন্যান্য সম্পদের মত শস্য ও ফলের উপর যাকাত নিসাব পরিমান পূর্ণ হওয়ার পর এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ধার্য করা হয় না। বরং কৃষি মৌসুমে যদি উৎপাদিত শস্য নিসাব পরিমান পূর্ণ হয় তাহলে ঐ মৌসুমেই যাকাত আদায় করতে হবে। কুরআনের একটি আয়াতে এ ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ

{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١]

অর্থঃ "ফসল তুলিবার দিনে উহার হক প্রদান করিবে।"[২৪]

কাজেই একই বছরে জমিতে যতবার ফসল উৎপন্ন হবে ততবারই যাকাত আদায় করতে হবে।

ফল ও শস্য যখনই পরিপক্ক হয় তখনই তার উপর যাকাত ধার্য হয়। ফল ও শস্য প্রথমে সংগ্রহ করে স্তুপ করে সাজিয়ে নিতে হবে। ফসল যদি সংগ্রহ করার আগেই অনিচ্ছাকৃতভাবে এবং কোন অবহেলা ছাড়াই নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার উপর যাকাত ধার্য হবে না। শস্য ও ফলের উপর যাকাত শুধুমাত্র ঐব্যক্তির উপরই ধার্য হবে যে তার জমির পাকা ফসল অন্যের নিকট বিক্রি করে বা অপরকে দান করে। ফসল পাকার পর জমির মালিক মারা গেলেও তার উপর যাকাত ধার্য হবে। কিন্তু মালিক ফসল পাকার আগেই মারা গেলে যাকাত তার স্থলাভিষিক্তের উপর বর্তাবে অর্থাৎ মালিকের উত্তরাধিকারীকে যাকাত পরিশোধ করতে হবে।

শস্য ও ফলের উপর যাকাত নির্নয়

শস্য ও ফলের উপর যাকাতের পরিমাণ তার উৎপাদন ব্যয় এবং সেচ কার্যে প্রদত্ত খরচের ভিত্তিতে পরিবর্তনশীল। যেমনঃ
ব্যয়হীন, আরামদায়ক (বৃষ্টির পানি, নদী বা খালের পানি ইত্যাদি) সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যাকাতের পরিমাণ হবে ওশর (দশভাগের একভাগ)।

[২৪] সুরা আনআম ১৪১।

ব্যয়বহুল সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে (যেমনঃ কুপ খনন করে পানি সংগ্রহ করা কিংবা পানি ক্রয় করা) যাকাতের পরিমাণ হবে নিস্‌ফুল ওশর (বিশভাগের একভাগ) শতকরা হিসাবে খুমুস (একশভাগের পাঁচভাগ)
কোন জমির ফসল যদি উপরোক্ত উভয় পদ্ধতিতে সেচ করা হয় তাহলে প্রধান সেচ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে যাকাতের হার নির্ধারিত হবে। কিন্তু উভয় পদ্ধতিই যদি সমান হয় তাহলে যাকাতের পরিমাণ হবে ৭.৫০%। যদি তা নির্নয় করা কঠিন হয়ে পড়ে তাহলে যাকাতের পরিমাণ হবে ১০%।

শস্য ও ফলের উপর আনুমানিক যাকাত নির্নয়

অনেক সময় জমির মালিকের হাতে জমিতে উৎপন্ন শস্য ও ফল পরিমাপ করার জন্য পর্যাপ্ত সময় থাকে না। এক্ষেত্রে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ দিয়ে ফসলের পরিমাপ নির্ণয় করিয়ে নিয়ে তদনুযায়ী যাকাত প্রদান করতে পারেন। ইমাম আওজাঈ এবং ইমাম লাইস (রঃ) এর অভিমত অনুযায়ী অনুমান ভিত্তিক এই পদ্ধতি সব রকম শস্য ও ফলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যাকাত নির্ণয়ের কাজ শস্য বা ফল পাকার পর এবং ক্ষেত্র বিশেষে (যেমন খেজুর ও কিসমিসের ক্ষেত্রে) শুকানোর প্রক্রিয়া শেষ করার পর শুরু করা উচিত।

শস্য ও ফলের যেই অংশের উপর যাকাত ফরজ হবে না

ফল ও শস্যাদির মালিক নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে যাকাত প্রদানে বাধ্য নয়:
ক) ফল কাঁচা থাকা অবস্থাতেই মালিক যে অংশ খেয়ে ফেলে বা ভোগ করে ফেলে তার উপর।
খ) ফল বা ফসলের যে অংশ চাষ কাজে ব্যবহৃত গবাদি পশু ভক্ষণ করে ফেলে তার উপর।
গ) পথচারীগণ কর্তৃক ভক্ষণ করে ফেলা অংশের উপর।
ঘ) জনহিতকর কাজে দান করে দেয়া অংশের উপর।

চাষাবাদের ব্যয় কর্তনঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য আলেমদের মতেঃ জমি চাষ, বীজ বপন বা চারা রোপন, সার প্রদান এবং শস্য কর্তণ

সম্পর্কিত সমুদয় খরচ বাদ দিয়ে বাকি কৃষিপণ্যের উপর যাকাত আদায় করতে হবে।

ইজারাকৃত সম্পত্তিতে উৎপাদিত শস্য ও ফলের উপর যাকাত

ইজারা গ্রহিতাকে ইজারাকৃত জমিতে উৎপাদিত শস্য ও ফলের উপর যাকাত প্রদান করতে হবে। পক্ষান্তরে জমির মালিক (ইজারাদাতা) ইজারা মূল্যকে (জমির ভাড়াকে) তার মালিকানাধীন নগদ অর্থসহ অন্যান্য সম্পদের মূল্যের সাথে যোগ করে মোটমূল্যের উপর ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করবে।

চুক্তি ভিত্তিক বা বর্গাচাষের কারণে জমিতে উৎপাদিত ফসল অন্য কারও সাথে বন্টিত হলে (যেমন জমির মালিক জমির চাষাবাদ বা সেচ-কার্যের যত্ন নেয়ার জন্য অন্য কাউকে নিয়োজিত করে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের অংশ প্রদানে সম্মত হলে) এবং বন্টিত অংশের পরিমাণ নিসাব পর্যায়ে পৌঁছলে উভয় পক্ষকেই যাকাত প্রদান করতে হবে।

শস্য ও ফলের উপর যাকাত সম্পর্কিত সাধারণ নীতিমালা

১) সমজাতীয় শস্য ও ফল একত্র করে পরিমাপ করা যাবে। তবে বিভিন্ন ধরণের শস্য ও ফল। যেমন: ফল ও শাকসবজি পৃথকভাবে পরিমাপ করতে হবে।

২) উৎপাদিত শস্যের মধ্যে গুণগত মানের তারতম্য দেখা গেলে গড় হারে (নিম্নতর হারে নয়) যাকাত প্রদান করতে হবে।

৩) একই ব্যক্তির মালিকানায় একাধিক বা বিভিন্ন মানের জমিতে আবাদের খরচ একত্রে যোগ করে নিতে হবে।

৪) যদিও উৎপাদিত ফসল থেকেই জমির মালিককে যাকাত প্রদান করতে হবে, তবে কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম বাজার দরের ভিত্তিতে নগদে যাকাত প্রদানকে অনুমোদন করেন।

চতুর্থ প্রকার: পশুর যাকাতের বিস্তারিত বিবরণ

গবাদি পশুর উপর যাকাতের বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে করা হলো।

উট, গরু, মহিষ, ভেড়া এবং ছাগল ইত্যাদি গবাদি পশুর অন্তর্ভূক্ত।

গবাদি পশুর উপর যাকাত প্রদানের শর্ত: গবাদি পশুর উপর যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু শর্ত রয়েছে। শর্তগুলো পূরণ না হওয়া পর্যন্ত

গবাদি পশুর উপর যাকাত ধার্য হবে না। নিয়ন্ত্রন শিথিল করে গবাদি পশুর মালিককে যাকাত প্রদানে স্বত:স্ফুর্তভাবে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই এসব শর্তের উদ্দেশ্য। এভাবে যেসব মহৎ উদ্দেশ্যে যাকাত আরোপিত হয়েছিল তা অর্জন নিশ্চিত করে। শর্তগুলি হল:

১) নিসাব পরিমান হওয়া

উটের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৫টির মালিকানাই যাকাতের জন্য নিসাব বলে গণ্য হবে। ৫টি উটের নিচে যাকাত ফরজ নয়। ছাগল, দুম্বা ও ভেড়ার ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির মালিকানায় ৪০টির কম হলে যাকাত ফরজ নয়। গরু ও মহিষের ক্ষেত্রে ৩০টির কম হলে তার উপর যাকাত ধার্য হবে না।

২)পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া

যাকাতের জন্য বিবেচ্য সর্বনিম্ন (নিসাব) পরিমাণ সম্পদ মালিকানায় আসার দিন থেকে পূর্ণ এক বছর দখলে না থাকলে এর উপর যাকাত ধার্য হয় না। রাসুলে করিম (সা:) হাদিসে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ
« لاَ زَكَاةَ فِى مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

অর্থ: "আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত হাদীস তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সা: কে বলতে শুনেছি; 'সম্পদের মালিকানা এক বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত এর উপর যাকাত আরোপিত হয় না'।"[২৫]

গবাদি পশু যদি চলতি বছরে বাচ্চা দান করে তা হলে উক্ত বাচ্চা বা বাচ্চাগুলোর মূল্যও গবাদি পশুর মূল্যের সাথে যোগ করতে হবে। যদি গবাদি পশুর বিক্রয় বা বিনিময়ের জন্য এদের মালিকানার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয় তাহলে বিক্রয় বা বিনিময়ের দিন থেকে একটা নতুন বছরের গণনা শুরু করা হবে। তবে শর্ত থাকে যে, গবাদি পশুর মালিক যাকাত এড়াবার উদ্দেশ্যে এরূপ বিক্রয় বা বিনিময় কার্য সম্পাদন না করতে হবে।

৩) চাষাবাদ কার্যে ব্যবহৃত গবাদি পশু না হওয়া: চাষাবাদ ও পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত গবাদি পশু যাকাতের জন্য গণনা করা হয় না।

৪) সায়েমা হওয়া।

[২৫] সুনানে ইবনে মাজাহ ১৭৯১।

বছরের বেশীরভাগ সময় বৈধ ঘাসের মাঠে ও চারণভূমিতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে যে পশুগুলো জীবিকা নির্বাহ করে তাকে সায়েমা বলে।

সাধারণত: পশুগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১) اَنْ تَكُوْنَ سَـــائِمَةً সায়েমা। অর্থাৎ বছরের বেশীরভাগ সময় বৈধ ঘাসের মাঠে ও চারণভূমিতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে যে পশুগুলো জীবিকা নির্বাহ করে এবং সেগুলোকে বংশবৃদ্ধি ও দুগ্ধআহরণের জন্য লালন-পালন করা হয় এই প্রকার পশুতেই যাকাত ফরজ হয়।

২) اَنْ تَكُوْنَ مَعْلُوْفَةً যে পশুগুলো বংশ বৃদ্ধি ও দুগ্ধ আহরণের জন্য লালন-পালন করা হয় বটে তবে বছরের বেশীরভাগ সময় নিজেরা মাঠে বিচরণ করে ঘাস-পানি খায় না। বরং মালিককে খাদ্য ক্রয় করে বা কেটে এনে খাওয়াতে হয়। এ প্রকার পশুতে যাকাত নাই।

৩) اَنْ تَكُوْنَ عَامِلَـــةً যে সকল পশু বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন: গরুর গাড়ী চালানের জন্য, পিঠে বোঝা বহন করার জন্য, সওয়ার হওয়ার জন্য, কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য, হালচাষ করার জন্য, পানি উত্তোলন করার জন্য ইত্যাদি। এই প্রকার পশুর উপরে অধিকাংশ আলেমদের মতে যাকাত ফরজ হবে না। তবে মালেকী মাযহাব মতে এই প্রকার পশুতেও যাকাত ফরজ হবে।

৪) اَنْ تَكُوْنَ مُعَدَّةً لِلتِّجَـــارَةِ যে সকল পশু ব্যবসার জন্য (বেচাকেনার জন্য) প্রস্তুত রাখা হয়। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে যে কোন পশুসম্পদ প্রতিপালন করা হলে সেগুলোকে ব্যবসায়িক পণ্য বলে গণ্য করা হবে এবং এদের উপর যাকাত সংখ্যার ভিত্তিতে নয়, মূল্যের ভিত্তিতে ধার্য হবে। অতএব, পশুসম্পদের উপর যাকাত ধার্য হবে যদি তাদের মূল্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সর্বনিম্ন অর্থমূল্যের (নিসাব) সমান হয়। এক্ষেত্রে পশুর মালিক পশুর নির্ধারিত মূল্যকে তার মালিকানাধীন নগদ অর্থ ও ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্যের সাথে যোগ করে মোট মূল্যের ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করবেন, যদি বিধি মোতাবেক তার উপর যাকাত ধার্য হয়।

কিন্তু অবস্থা যদি এমন হয় যে, মালিকানাধীন পশুকে ব্যবসায়িক পণ্য বলে গণ্য করা হলে তার মূল্য যাকাতযোগ্য সর্বনিম্ন সীমার (নিসাব) চেয়ে কম হয়, কিন্তু সংখ্যার ভিত্তিতে হিসাব করা হলে যাকাতযোগ্য হয়, সেক্ষেত্রে

সংখ্যা-ভিত্তিক পদ্ধতিতে যাকাত প্রযোজ্য হবে। তবে উলেখ্য যে, কেবল মাত্র উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার ক্ষেত্রেই সংখ্যা ভিত্তিক হিসাব প্রযোজ্য হবে , অন্যান্য পশুসম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

গবাদি পশুর যাকাতের হার ও পরিমাণ

উটের ক্ষেত্রে যাকাতের পরিমাণ

মালিকানাধীন উটের যাকাত ও নিসাবের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

উটের সংখ্যা	ধার্যকৃত যাকাতের পরিমাণ
১ থেকে ৪ পর্যন্ত	যাকাত আদায়ের প্রয়োজন নেই
৫ থেকে ৯ পর্যন্ত	১টি ভেড়া/ছাগল
১০ থেকে ১৪ পর্যন্ত	২টি ভেড়া/ছাগল
১৫ থেকে ১৯ পর্যন্ত	৩টি ভেড়া/ছাগল
২০ থেকে ২৪ পর্যন্ত	৪টি ভেড়া/ছাগল
২৫ থেকে ৩৫ পর্যন্ত	১ থেকে ২ বছর বয়সের ১টা স্ত্রী উট
৩৬ থেকে ৪৫ পর্যন্ত	২ থেকে ৩ বছর বয়সের ১টা স্ত্রী উট
৪৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত	৩ থেকে ৪ বছর বয়সের ১টা স্ত্রী উট
৬১ থেকে ৭৫ পর্যন্ত	৪ থেকে ৫ বছর বয়সের ১টা স্ত্রী উট
৭৬ থেকে ৯০ পর্যন্ত	২ থেকে ৩ বছর বয়সের ২টা স্ত্রী উট
৯১ থেকে ১২০ পর্যন্ত	৩ থেকে ৪ বছর বয়সের ২টা স্ত্রী উট

১২১ থেকে ১২৯ পর্যন্ত	২ থেকে ৩ বছর বয়সের ৩টা স্ত্রী উট
১৩০ থেকে ১৩৯ পর্যন্ত	৩ থেকে ৪ বছর বয়সের ১টা স্ত্রী উট এবং ২ থেকে ৩ বছর বয়সের ২টা স্ত্রী উট
১৪০ থেকে ১৪৯ পর্যন্ত	৩ থেকে ৪ বছর বয়সের ২টা স্ত্রী উট এবং ২ থেকে ৩ বছর বয়সের ২টা স্ত্রী উট
১৫০ থেকে ১৫৯ পর্যন্ত	৩ থেকে ৪ বছর বয়সের ৩টা স্ত্রী উট
১৬০ থেকে ১৬৯ পর্যন্ত	২ থেকে ৩ বছর বয়সের ৪টা স্ত্রী উট
১৭০ থেকে ১৭৯ পর্যন্ত	২ থেকে ৩ বছর বয়সের ৩টা স্ত্রী উট এবং ৩ থেকে ৪ বছর বয়সের ১টা স্ত্রী উট
১৮০ থেকে ১৮৯ পর্যন্ত	২ থেকে ৩ বছর বয়সের ২টা স্ত্রী উট এবং ৩ থেকে ৪ বছর বয়সের ২টা স্ত্রী উট
১৯০ থেকে ১৯৯ পর্যন্ত	৩ থেকে ৪ বছর বয়সের ৩টা স্ত্রী উট এবং ২ থেকে ৩ বছর বয়সের ১টা স্ত্রী উট
২০০ থেকে ২০৯ পর্যন্ত	৩ থেকে ৪ বছর বয়সের ৪টা স্ত্রী উট অথবা ২ থেকে ৩ বছর বয়সের ৫টা স্ত্রী উট

গরু ও মহিষের ক্ষেত্রে যাকাতের পরিমাণ

গরু ও মহিষের যাকাত ও নিসাবের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

গরু/মহিষের সংখ্যা	ধার্যকৃত যাকাতের পরিমাণ
১ থেকে ২৯	যাকাত প্রদেয় হয় না

পর্যন্ত	
৩০ থেকে ৩৯ পর্যন্ত	১টি ১ বছর বয়সের ষাড়
৪০ থেকে ৫৯ পর্যন্ত	১টি ২ বছর বয়সের গাভী
৬০ থেকে ৬৯ পর্যন্ত	২টি ১ বছর বয়সের ষাড় বা গাভী
৭০ থেকে ৭৯ পর্যন্ত	১টি ২ বছর বয়সের গাভী এবং ১টি ১ বছর বয়সের ষাড়
৮০ থেকে ৮৯ পর্যন্ত	২টি ২ বছর বয়সের গাভী
৯০ থেকে ৯৯ পর্যন্ত	৩টি ১ বছর বয়সের গাভী
১০০ থেকে ১০৯ পর্যন্ত	১টি ২ বছর বয়সের গাভী এবং ২টি ১ বছর বয়সের ষাড়
১১০ থেকে ১১৯ পর্যন্ত	২টি ২ বছর বয়সের বয়সের ষাড় গাভী এবং ১টি ১ বছর বয়সের ষাড়
১২০ থেকে ১২৯ পর্যন্ত	৩টি ২ বছর বয়সের গাভী এবং ৪টি ১ বছর বয়সের ষাড়

উপরোক্ত পরিমাণের চেয়ে মালিকানাধীন গরু/মহিষের সংখ্যা বেশি হলে যাকাতের পরিমাণ নিম্নোক্ত উপায়ে নির্ধারিত হবে -

মালিকানাধীন গরু/মহিষের সংখ্যা প্রতি ৩০টি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ১ বছর বয়সের ১টা গাভী বা ষাড় যাকাত বলে গণ্য হবে।

মালিকানাধীন গরু/মহিষের সংখ্যা প্রতি ৪০টি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ২ বছর বয়সের ১টা গাভী বা ষাড় যাকাত বলে গণ্য হবে।

ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার ক্ষেত্রে যাকাতের পরিমাণ

ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার যাকাত ও নিসাবের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

ছাগল/ভেড়া/দুম্বার সংখ্যা	ধার্যকৃত যাকাতের পরিমাণ
১ থেকে ৩৯ পর্যন্ত	যাকাত প্রদেয় হয় না

৪০ থেকে ১২০ পর্যন্ত	১টি ছাগল/ভেড়ী/দুম্বা
১২১ থেকে ২০০ পর্যন্ত	২টি ছাগল/ভেড়ী/দুম্বা
২০১ থেকে ৩৯৯ পর্যন্ত	৩টি ছাগল/ভেড়ী/দুম্বা
৪০০ থেকে ৪৯৯ পর্যন্ত	৪টি ছাগল/ভেড়ী/দুম্বা
৫০০ থেকে ৫৯৯ পর্যন্ত	৫টি ছাগল/ভেড়ী/দুম্বা

প্রতি ১০০টি অতিরিক্ত ছাগল/ভেড়ী/দুম্বার জন্য ১টি ছাগল/ভেড়ী/দুম্বা যাকাত বাবদ গণ্য হবে।

খামারে উৎপাদিত সম্পদের যাকাত

সূদীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত পদ্ধতিতে মানুষ ফসল উৎপাদন করে আসছে। আল্লাহ্‌র প্রদত্ত মাটি, পানি, বাতাস ও রৌদ্র কৃষি উৎপাদনের প্রধান উপকরণ বিধায় সামান্য শ্রম ও খরচে মানুষ ফসল ও অন্যান্য কৃষিজাত সম্পদ উৎপাদন করে আসছে। আর মনুষ্য পরিশ্রম ছাড়াই জন্মে নানান উদ্ভিদ যেমনঃ বনজ বৃক্ষ, ঘাস, নলখাগড়া, লতা-পাতা ইত্যাদি। বর্তমান যুগে মানুষ আল্লাহ্‌র প্রদত্ত উপকরণের সাথে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, শ্রম ও পুঁজি বিনিয়োগ করে খামার ব্যবস্থাপনায় উন্নত জাত ও অধিক উৎপাদনশীল কৃষিজাত দ্রব্য, মৎস্য ও পশুসম্পদ উৎপাদন করে। কোন কোন খামারের সাথে শিল্প প্রক্রিয়া সংক্রান্ত উৎপাদন ব্যবস্থাও অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

এসব খামার বলতে কৃষি খামার, হার্টিকালচার, বীজ উৎপাদনের খামার, নার্সারী, হাঁস-মুরগীর খামার, পশু-সম্পদ খামার, দুগ্ধ খামার, মৎস খামার, পিসিকালচার ইত্যাদিকে বুঝায়। বানিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে উঠা এসব খামার আধুনিক শিল্প হিসাবে স্বীকৃত এবং অর্থনীতিতে রেখেছে ব্যাপক অবদান। এসব খামার বানিজ্যিকভাবে পরিচালিত হয় বলে বানিজ্যিক সম্পদ হিসাবে এগুলোর উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে।

ক) কৃষি খামার

ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা হলে বনজ বৃক্ষ, ঘাস, নলখাগড়া, ঔষধি বৃক্ষ, চা বাগান, রাবার চাষ, তূলা, সিল্ক, আগর, ফুল, অর্কিড ইত্যাদি যাকাতের আওতাভুক্ত হবে। বিক্রির উদ্দেশ্যে নার্সারীতে উৎপাদিত বীজ, চারা, কলম ইত্যাদিও যাকাতের আওতাভুক্ত হবে।

জমি চাষ, বীজ বপন বা চারা রোপন, সার প্রদান এবং শস্য কর্তণ সম্পর্কিত উৎপাদন খরচ যাকাতের জন্য নিরূপিত পরিমাণ থেকে বাদ দিতে

হবে, তবে এসব খরচের পরিমাণ ফসলের নিরূপিত পরিমাণের এক-তৃতীয়াংশের বেশি বাদ যাবে না। খরচ বাদ দিয়ে বাকি ফসলের উপর যাকাত প্রদান করতে হবে।

ভূমি থেকে উৎপন্ন ফসল আসার সাথে সাথে যাকাত পরিশোধ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই। বৎসরে একাধিকবার ফসল আসলে একাধিকবার যাকাত পরিশোধ করতে হবে। বৃক্ষ কাটার সময় যাকাত পরিশোধ করতে হবে।

যে জমিতে সেচ প্রয়োজন হয় না, প্রাকৃতিক ভাবে সিক্ত হয়, তার ফসলের যাকাত হচ্ছে দশ ভাগের একভাগ (১০%)। আর যে জমিতে সেচের প্রয়োজন হয়, তার ফসলের যাকাত হচ্ছে বিশ ভাগের একভাগ (৫%)।

খামারে শিল্প প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করা হলে (যেমন ফলজাত প্রক্রিয়া, চা, রাবার, আগর ইত্যাদি) সে সব পণ্য ব্যবসায়িক পণ্য বলে গণ্য হবে এবং যাকাতের আওতাভুক্ত হবে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃতমজুদ কাঁচামাল ও প্যাকিং সামগ্রী, ব্যবসার নগদ অর্থ ও অন্যান্য চলতি সম্পত্তি যোগ করে যাকাত নির্ধারণ করতে হবে। উলেখ্য যাকাত পরিশোধ করা কৃষি ফসল কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার হলে, ঐ মজুদ কাঁচামালের উপর ব্যবসার সম্পদ হিসাবে দ্বিতীয়বার যাকাত দিতে হবে না, কারণ একই সম্পদের উপর একই বৎসরে দুইবার যাকাত হয় না। তবে ক্রয়কৃত কাঁচামালের উপর যাকাত ধার্য হবে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত স্থায়ী সম্পদের (যেমন-জমি, দালান, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, যানবাহন ইত্যাদি) উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে না।

খ) হাঁস-মুরগীর খামার

ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে খামারে পালিত হাঁস-মুরগী, ডিম, বাচ্চা, সার হিসাবে আবর্জনা ইত্যাদি ব্যবসায়িক পণ্য হিসাবে যাকাতের আওতাভুক্ত হবে। তাছাড়া (কাঁচামাল বিবেচনায়) হাঁস-মুরগীর মজুদ খাবার, ব্যবসার নগদ অর্থ ও অন্যান্য চলতি সম্পত্তির সাথে যোগ করে যাকাত নির্ধারণ করতে হবে।

খামারে শিল্প প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করা হলে (যেমন বাচ্চা ফুটানো, মাংস প্রক্রিয়া ইত্যাদি) সে সব পণ্য ব্যবসায়িক পণ্য বলে গণ্য হবে এবং যাকাতের আওতাভুক্ত হবে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত মজুদ কাঁচামাল ও

প্যাকিং সামগ্রী, ব্যবসার নগদ অর্থ ও অন্যান্য চলতি সম্পত্তি যোগ করে যাকাত নির্ধারণ করতে হবে। তবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত স্থায়ী সম্পদের উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে না।

গ) মৎস খামার

ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে খামারে পালিত মৎস্য, রেণু, পোনা ইত্যাদি ব্যবসার সম্পদ হিসাবে যাকাতের আওতাভুক্ত হবে। মজুদ মৎস্য খাদ্য, ব্যবসার নগদ অর্থ ও অন্যান্য চলতি সম্পত্তির সাথে যোগ করে যাকাত নির্ধারণ করতে হবে।

খামারে শিল্প প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করা হলে (যেমন মৎস্য প্রক্রিয়া ইত্যাদি) সে সব পণ্য ব্যবসায়িক পণ্য বলে গণ্য হবে এবং যাকাতের আওতাভুক্ত হবে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত মজুদ কাঁচামাল ও প্যাকিং সামগ্রী, ব্যবসার নগদ অর্থ ও অন্যান্য চলতি সম্পত্তি যোগ করে যাকাত নির্ধারণ করতে হবে। তবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত স্থায়ী সম্পদের উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে না।

ঘ) পশু সম্পদ খামার

ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পশুসম্পদ প্রতিপালন করা হলে সে সকল পশু, বাছুর, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রী, মাংস, চামড়া এবং সার হিসাবে গোবর, হাঁড় ইত্যাদি ব্যবসায়িক পণ্য বলে গণ্য করা হবে এবং মল্যের ভিত্তিতে যাকাত প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া মজুদ পশুখাদ্য, ব্যবসার নগদ অর্থ ও অন্যান্য চলতি সম্পত্তির সাথে যোগ করে যাকাত নির্ধারণ করতে হবে।

খামারে দুগ্ধ প্রক্রিয়া ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন করা হলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত মজুদ কাঁচামাল ও প্যাকিং সামগ্রী ইত্যাদি যাকাতের আওতাভুক্ত হবে। অনুরূপভাবে মাংস প্রক্রিয়া করা হলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃতমজুদ কাঁচামাল ও প্যাকিং সামগ্রী যাকাতের আওতাভুক্ত হবে। তবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত স্থায়ী সম্পদের উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে না।

পঞ্চম প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ

খনিজ সম্পদের উপর যাকাত

ক) ভূ-গর্ভ বা সমুদ্র-তল থেকে উত্তোলিত বিভিন্ন রকম খনিজ দ্রব্যকেই এক কথায় খনিজ সম্পদ বলে। তরল পেট্রোলিয়াম, কঠিন শিলা, কয়লা বা

লবন, বায়বীয় গ্যাস, ধাতব পদার্থ, লৌহ বা অধাতব গন্ধক সবই খনিজ সম্পদ বলে বিবেচিত হয়।

খ) যাকাতের জন্য খনিজ সম্পদের নিসাবের পরিমাণ স্বর্ণের বা রৌপ্যের পরিমাণের ভিত্তিতে (যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে) নিরূপিত হবে। খনিজ দ্রব্যগুলো খনি থেকে একবারে না একাধিক বারে খন্ড খন্ড করে উত্তোলন করা হল তা বিবেচ্য নয়। যদি যন্ত্রপাতি মেরামত বা শ্রমিকদের ধর্মঘটের কারণে জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে উত্তোলন কার্য বন্ধ থাকে তাহলে বিভিন্ন সময়ে উত্তোলিত খনিজ দ্রব্যের পরিমাণ যোগ করে যাকাতের নিসাব নির্ধারণ করতে হবে।

গ) খনিজ সম্পদের উপর যাকাত বার্ষিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয় না। খনিজ দ্রব্যের উত্তোলিত ও পরিশোধিত অংশের মূল্য নিসাব পরিমান পৌছঁলে তাৎক্ষণিকভাবে যাকাত আদায় করতে হবে।

ঘ) খনিজ সম্পদের উপর যাকাতের হার ২.৫%।

ঙ) ভূমি এবং সমুদ্রতল থেকে আহরিত বা উত্তোলিত সব ধরণের সম্পদই খনিজ সম্পদ বলে গণ্য হয়। মুক্তা, প্রবাল, মৎস্য, স্বচ্ছ বা রঙীন পাথর (অলংকারে ব্যবহারে উপযোগী) প্রভৃতির উপর যাকাত ব্যবসায়িক পণ্যের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রদান করতে হবে।

মাটির নীচে লুকানো বা গুপ্তধনের উপর যাকাত

গুপ্ত ধনের উপর যাকাত বার্ষিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয় না। গুপ্তধন আবিষ্কারের সাথে সাথে ২০% হারে যাকাত প্রদান করতে হবে। সংখ্যা গরিষ্ঠ বিশেষজ্ঞগণ এ মত পোষণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা:) এর হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়, হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـــالَ ..فِـــي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

অর্থ: আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেন," ভূ-গর্ভ থেকে যে গুপ্তধন পাওয়া যাবে তার এক-পঞ্চমাংশ যাকাত প্রদান করতে হবে"।[২৬]

[২৬] সহীহ বুখারী ১৪৯৯; সহীহ মুসলিম ৪৫৬২।

মূলধনী দ্রব্যের উপর যাকাত

মূলধনী দ্রব্য বলতে ঐ সব সম্পদকে বুঝায় যা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয়েও ভাড়া দানের মাধ্যমে মালিকের জন্য মুনাফা অর্জন করে। ভূ-সম্পত্তি, দালান-কোঠা, দোকানঘর, যানবাহন, ট্রাক, স্টিমার, উড়োজাহাজ প্রভৃতি এর আওতাধীন।

স্থায়ী সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হয় বলে যাকাতের জন্য এগুলো গণনা করা হয় না। তবে এসব সম্পত্তির আয়ের উপর যাকাত প্রদান করতে হবে। স্থায়ী সম্পত্তি থেকে অর্জিত আয় মালিকের নগদ অর্থ ও অন্যান্য ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্যের সাথে যোগ করে পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করতে হবে। সংখ্যা গরিষ্ঠ বিশেষজ্ঞগণ এ মত সমর্থন করেন।

প্রশ্ন: যাকাত বিতরণের খাতসমূহ কি কি?

উত্তর: যাকাত বিতরণের খাতসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ:

১) اَلْفُقَرَاءُ (ফকির) গরিব সম্প্রদায়

ক) যারা অভাবে আছে এবং নিজেদের মৌলিক প্রয়োজন মিটাতে পারে না তারাই গরিব। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে গরিব তারাই যাদের কোন সহায়-সম্পত্তি নেই এবং জীবিকা অর্জনের মতো উপায়-অবলম্বন নেই। হানাফীপন্থী আলেমদের মতে, যে পরিমাণ অর্থ থাকলে যাকাত ধার্য হতে পারে তার চেয়ে কম পরিমাণ অর্থের মালিকদের গরিব বলে। মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর দিক থেকে গরিবদের অবস্থা অভাবীদের চেয়ে খারাপ। যাহোক, কোন কোন চিন্তাবিদ বিপরীত ধারণা পোষণ করেন।

প্রকৃতপক্ষে গরিব এবং অভাবীদের মধ্যে এরূপ পার্থক্য নির্দেশের কোন বাস্তব কার্যকারিতা নেই। কারণ গরিব এবং অভাবী উভয় ধরণের লোকই যাকাত পাওয়ার যোগ্য।

খ) গরিবদের যাকাত বাবদ যে অর্থ প্রদান করা হবে তা তাদের এক বছরের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানসহ মৌলিক প্রয়োজনসমূহ মিটানোর উপযোগী হওয়া উচিত। যে সময়ে এবং যে এলাকায় যাকাত প্রদান করা হচ্ছে সে সময় এবং সে এলাকার প্রচলিত প্রথা ও রীতি অনুযায়ী মৌলিক প্রয়োজন নির্ধারণ করতে হবে।

গ) আইন অথবা আলেমদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাকাত পাওয়ার যোগ্য গরিবদের কোন লালনকারী না থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর গরীবদের নামের শেষে কুয়েতি যাকাত হাউজের (অনুচ্ছেদ ৪) যাকাত বিতরণ নিয়মাবলিতে প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে উল্লেখিত তালিকা অনুযায়ী নিম্নোক্তরা যুক্ত হবে ঃ এতিম, পরিত্যাক্ত শিশুদের নিয়ে গঠিত শিশুসদন, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা, বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত, অসুস্থ ও পঙ্গু ব্যক্তি, খুব কম আয়ের লোক, ছাত্র, বেকার, জেলবন্দী ও যুদ্ধবন্দীদের পরিবার।

২) اَلْمَسَاكِيْنُ (মিসকীন) অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি

অধিকাংশ আলেমদের মতে অভাবী লোক বলতে তাদের বুঝায় যাদের আয় মৌলিক প্রয়োজনসমূহ মিটানোর জন্য পর্যাপ্ত নয়। তবে আবূ হানিফা (রঃ) যাদের কোন আয় নেই, তাদেরকে অভাবী বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যাকাতের ব্যাপারে অভাবী লোকেরা গরিবদের সম পর্যায়ভুক্ত, হানাফী ও মালিকী মতের আলেমরা মনে করেন, যাকাতের দিক থেকে অভাবীরা (মিসকীন) গরিবদের (ফকির) চেয়ে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। অবশ্য হাম্বলী এবং শা'ফী মতের আলেরা গরিবদের যাকাত পাওয়ার অধিক যোগ্য বলে মনে করেন।

৩) اَلْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا (আমেল) যাকাত প্রশাসনে নিয়োজিত ব্যক্তি

যাকাত সংগ্রহ, মজুদ বা সংরক্ষণ করা, পাহারা দেয়া, নিবন্ধকরণ এবং বিতরণের কাজে সংশ্লিষ্টদের এক কথায় 'যাকাত প্রশাসনে নিয়োজিত ব্যক্তি' বলা যায়। তারা ইসলামী সরকারের সংস্থা অথবা 'ইসলামি ইমারাহ' কর্তৃক নিয়োজিত হয়। কুয়েত যাকাত হাউজের সৌজন্যে সিম্পোজিয়ামের তৃতীয় সুপারিশে বর্ণিত যাকাতের নিয়মাবলী প্রচারসহ যাকাত সংক্রান্ত সব ধরণের কাজের দায়িত্বই তারা বহন করে।

ইসলামের খেলাফত যুগে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় করা হতো। বর্তমানে খেলাফত ব্যবস্থা না থাকার কারণে মুসলিমদেরকে এক আমীরের অধিনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল-জামাআ'হ গঠন করতে হবে এবং তার অধিনে বাইতুল মাল গঠন করে যাকাত আদায় করতে হবে। এ বিভাগে যারা কর্মরত থাকবে তারা আমেল হিসাবে গণ্য হবে। এরা গরীব না হলেও তাদের বেতন ভাতা ইত্যাদির জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। যাকাত বিভাগে

কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কোন বস্তু বা নগদে প্রদত্ত কোন উপহার বা দান (তাদের পদের কারণে প্রদত্ত) গ্রহণ করতে পারবেন না ।

যাকাত বিভাগ ও প্রশাসনের প্রধান কার্যালয়গুলোকে প্রয়োজনীয় সকল অফিস সামগ্রী, যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র দ্বারা সজ্জিত করতে হবে। সরকারি ট্রেজারি, উপহার অথবা অনুদানের মাধ্যমে এগুলোর অর্থায়ণ সম্ভব না হলে যাকাত তহবিল থেকেই এগুলোর অর্থায়ণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া যাকাত প্রশাসকদের জন্য নির্ধারিত অংশ থেকেও এগুলোর অর্থায়ণ করা যাবে। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ যন্ত্রপাতি অবশ্যই যাকাত আদায় ও বিতরণ প্রক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য হবে অথবা যাকাতের সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

যাকাত কমিটিগুলো তাদের নিয়োগকারী বা অনুমোদন দানকারী সংস্থাকর্তৃক তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর দৃষ্টান্তের অনুসরণে এ কাজটি সম্পন্ন হওয়া উচিত। একজন যাকাত প্রশাসক যাকাতের অছি বা তত্ত্বাবধায়ক বলে গণ্য হন এবং অপব্যবহার বা অবহেলাজনিত ধ্বংস বা ক্ষতির জন্য দায়ী হন ।

যাকাত প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মচারীরা যাকাতদাতা ও যাকাতগ্রহীতা উভয়ের সাথে আচরণকালে ইসলামের সদাচারের আদর্শ লালন করবে, যাকাতের মহান আদর্শ তুলে ধরবে এবং এর বিতরণ ত্বরান্বিত করবে ।

কমিশন প্রদানের ভিত্তিতে যাকাত আদায় করা অর্থাৎ আদায়কৃত যাকাতের উপর যাকাত সংগ্রহকারীকে কমিশন প্রদান করা অবৈধ (আজমগড়ে অনুষ্ঠিত ইসলামিক ফিকাহ্ একাডেমী, ভারত এর পঞ্চম সেমিনারে প্রদত্ত ফতওয়া) ।

৪) اَلْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ আল মু'আল্লাফাতু কুলুবুহুম ঃ

যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য। মন জয় করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করার যে হুকুম এখানে দেয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা ইসলামের বিরোধিতায় ব্যাপকভাবে তৎপর এবং অর্থ দিয়ে যাদের শত্রুতার তীব্রতা ও উগ্রতা হ্রাস করা যেতে পারে অথবা যারা কাফেরদের শিবিরে অবস্থান করছে ঠিকই কিন্তু অর্থের সাহায্যে সেখান থেকে ভাগিয়ে এনে মুসলমানদের দলে ভিড়িয়ে দিলে তারা মুসলমানদের সাহায্যকারী হতে পারে কিংবা যারা সবেমাত্র ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং তাদের পূর্বেকার শত্রুতা বা দুর্বলতাগুলো দেখে আশংকা জাগে যে, অর্থ দিয়ে তাদের

বশীভূত না করলে তারা আবার কুফরীর দিকে ফিরে যাবে, এ ধরণের লোকদেরকে স্থায়ীভাবে বৃত্তি দিয়ে বা সাময়িকভাবে এককালীন দানের মাধ্যমে ইসলামের সমর্থক ও সাহায্যকারী অথবা বাধ্য ও অনুগত কিংবা কমপক্ষে এমন শত্রুতে পরিণত করা যায়, যারা কোন প্রকার ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। এ খাতে গনীমতের মাল ও অন্যান্য উপায়ে অর্জিত অর্থ থেকেও ব্যয় করা যেতে পারে। এ ধরণের লোকদের জন্য ফকীর, মিসকীন বা মুসাফির হবার শর্ত নেই। বরং ধনী ও বিত্তশালী হওয়া সত্ত্বেও তাদের যাকাত দেওয়া যেতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সা: এর মৃত্যুর পর এই খাতটি বহাল আছে কিনা এব্যাপারে ওলামাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম আহমদ, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী এর নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী পবিত্র কুরআনে বর্ণিত অন্যান্য খাতের মত এ খাতটিও বহাল আছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মালেক এবং শাফেয়ী র: এর একটি মত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সা: এর মৃত্যুর পরে এ খাতটি বাতিল হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ সুব: ইসলামকে বিজয় দান করেছেন। সুতরাং এখন আর কারো মন জয় করার প্রয়োজন নাই। তারা এই মতের স্বপক্ষে দলীল পেশ করতে গিয়ে বলেন যে, ওমর (রা:) যখন খলিফা হলেন তখন এই খাতে পূর্বের থেকে যাদেরকে যাকাতের অর্থ দেয়া হত তা তিনি বন্ধ করে দেন। এবং তাদেরকে জানিয়ে দিলেন:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كَانَ يَتَأَلَّفُكُمَا وَالإِسْلاَمُ يَوْمَئِذٍ ذَلِيــلٌ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَزَّ الإِسْلاَمَ فَاذْهَبَا فَاجْهَدَا(سنن البيهقي لأبو بكر البيهقي)

অর্থ: "যখন ইসলাম অসহায় অবস্থায় ছিল তখন রাসূলুল্লাহ সা: তোমাদের মন জয় করার জন্য যাকাত দিতেন। এখন আল্লাহ সুব: ইসলামকে বিজয় দান করেছেন। এখন তোমরা গিয়ে তোমদের কাজকর্ম করো।[২৭]

মন্তব্য: মূলত: ওমর ইবনে খাত্তাব (রা:) এই খাতটিকে স্থায়ীভাবে রহিত করার জন্য একথা বলেন নাই বরং তখন যেহেতু প্রয়োজন ছিল না তাই তিনি দেন নাই কাজেই যদি কখনো প্রয়োজন দেখা দেয় তখন যদি ইমামুল মুসলিমীন ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যানের সার্থে ভাল মনে করেন দিতে

[২৭] সুনানে বায়হাকী ১৩৫৬৮ ।

পারবেন। বিশেষ করে বর্তমান যুগে যেখানে ইসলাম পরাজিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও ভূলুণ্ঠিত সেক্ষেত্রে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে।

৫) فِي الرِّقَابِ (ফির রিক্বাব) দাস মুক্তি

দাস প্রথা বর্তমানে চালু নাই। কাজেই দাস থেকে মুক্তির জন্য নির্ধারিত যাকাতের অংশ অন্যান্য খাতে বিতরণ করা উচিত। অবশ্য কোন কোন আলেম মনে করেন যে, যাকাতের এ অংশ মুসলিম যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করার জন্য ব্যয় করা উচিত। যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে গিয়ে জালিমের জিন্দান খানায় বন্দি হয়ে আছে।

৬) اَلْغَارِمِيْنَ (আল গারিমীন) ঋণমুক্তির জন্য

ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করে দায় মুক্ত হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে এ খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

ক) অপরিহার্য প্রয়োজন মিটাবার জন্য যে ঋণ গৃহীত হয়েছে। তবে কয়েকটি শর্ত প্রযোজ্য:

১. পাপ বা অপরাধমূলক কাজ করার জন্য ঋণটি গৃহীত হয়নি।
২. ঋণ শোধ না করলে ঋণগ্রহীতা কারারুদ্ধ হতে বাধ্য।
৩. ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে অক্ষম।
৪. ঋণের মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে অথবা যাকাত গ্রহণের সময় ঋণটি পরিশোধ করার সময় হয়েছে।

খ) সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণ, যেমন হত্যার দন্ড হিসাবে প্রদত্ত অর্থ অথবা দুই বা ততোধিক বিবাদমান পক্ষের মধ্যে সমঝোতার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান। এসব ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত না হলেও যাকাত পাওয়ার যোগ্য।

গ) অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয়া বা জামিনদার হওয়ার ফলে গৃহীত ঋণ পরিশোধে বাধ্য হওয়া, যদি ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদার উভয়েই ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়ে।

ঘ) 'দিয়্যাত আদায় করার জন্য' অর্থাৎ নরহত্যার খেসারত যদি হত্যাকারীর পরিবার অথবা সরকার বহন করতে অক্ষম হয়।

অবশ্য পরিকল্পিত হত্যাকান্ডের খেসারত প্রদানের জন্য যাকাত দেয়া যাবে না। তবে সড়ক দূর্ঘটনা জনিত খেসারতের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের সহায়তা দেয়ার জন্য যাকাত বহির্ভূত অর্থে বিশেষ তহবিল গঠনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

৭) فِيْ سَبِيْلِ اللهِ (ফি সাবিল্লিহি) আল্লাহর পথে

'সালাফে সালেহীন' বা প্রথম যুগের ইমামগণের অধিকাংশ অংশ যে মত পোষণ করেছেন সেটিই যথার্থ সত্য।

তাদের মতে এখানে আল্লাহর পথে বলতে আল্লাহর পথে জিহাদ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেসব যুদ্ধ ও সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য কুফরী ব্যবস্থাকে উৎখাত করে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। যেসব লোক যুদ্ধ ও সংগ্রামে রত থাকে, তারা নিজেরা সচ্ছল ও অবস্থাসম্পন্ন হলেও এবং নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তাদেরকে সাহায্য করার প্রয়োজন না থাকলেও তাদের সফর খরচ বাবদ এবং বাহন, অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি সংগ্রহ করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। অনুরূপ যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের সমস্থ সময় ও শ্রম সাময়িক বা স্থায়ীভাবে এ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যও যাকাতের অর্থ এককালীন বা নিয়মিত ব্যয় করা যেতে পারে।

এখানে আর একটি কথা অনুধাবন করতে হবে। প্রথম যুগের ইমামগণের বক্তব্যে সাধারণত এ ক্ষেত্রে 'গাযওয়া' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি যুদ্ধের সমার্থক। তাই লোকেরা মনে করে যাকাতের ব্যয় খাতে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বা আল্লাহর পথের যে খাত রাখা তা শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু আসলে জিহাদ 'ফী সাবীলিল্লাহ' যুদ্ধ বিগ্রতের চাইতে আরো ব্যাপকতর জিনিসের নাম। কুফুরের বানীকে অবদমিত এবং আল্লাহর বাণীকে শক্তিশালী ও বিজয়ী করা আর আল্লাহর দীনকে একটি জীবন ব্যবস্থা হিসেবে কায়েম করার জন্য দাওয়াত ও প্রচারের প্রাথমিক পার্যায়ে অথাব যুদ্ধ-বিগ্রতের চরম পর্যায়ে যেসাব প্রচেষ্ট ও কাজ করা হয়, তা সবই এ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর আওতাভূক্ত। কুরআনের আরেকটি আয়াতে বিষয়টিকে আরও সুন্দর করে বলা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে:

{لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}

অর্থ: "বিশেষ করে এমন সব গরীব লোক সাহায্য লাভের অধিকারী, যারা আল্লাহর কাজে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টা চালাতে পারে না এবং তাদের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে স্বচ্ছল বলে মনে করে। তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের ভেতরের অবস্থা জানতে পারো। মানুষের পেছনে লেগে থেকে কিছু চাইবে এমন লোক তারা নয়।" [২৮]

এ আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় আটকে গিয়েছে বলতে মুজাহিদীনদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ তারা জিহাদ করতে গিয়ে ব্যস্ত থাকায় কামাই-রোজগার, ব্যবসা-বানিজ্য করতে পারে না। তাদের লেবাস পোষাক দেখলেও তাদেরকে অভাবী মনে হয় না। রাসূল (সা:) এর সময় মুহাজিরগণ ও আনসারদের মধ্যে থেকে আসহাবে সুফ্‌ফাহ নামে তিন চারশ লোকের একটি দল ছিল যারা সার্বক্ষণিক আল্লাহর রাসূল (সা:) এর কাছেই থাকতেন। যাকে যখন যে দায়িত্ব দেয়া হত তারা পূরণ করত। জিহাদের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন।

এ আয়াতে বিশেষ করে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বর্তমানেও এরকম একদল মুজাহিদীন তৈরি করা প্রয়োজন যারা সেই আসহাবে সুফ্‌ফাহর মত সদা প্রস্তুত থাকবে। যখনই কোন নাস্তিক, মুরতাদ ইসলামের কোন বিষয় কটাক্ষ করবে অথবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে তখনই তাদের উপর আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করবে। এরকম বাহিনী তৈরি করার জন্য তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। তাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র কিনে দেয়ার জন্য এবং তাদের পরিবারের খোরপোষের ব্যবস্থা করার জন্য যাকাত এবং সাদাকার একটি বড় অংশ ব্যয় করা খুবই জরুরী।

৮) اِبْنُ السَّبِيْلِ (ইবনুস সাবীল) নিঃসহায় পথচারী

নিঃসহায় পথচারী বলতে এমন একজন ভ্রমণকারীকে বুঝায় যার হাতে বাড়িতে ফিরে আসার মত পর্যাপ্ত অর্থ নাই। নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে তার যাকাত পাওয়ার অধিকার আছে ঃ

ক) সে অবশ্যই তার নিজ এলাকার বাইরে অন্য কোন এলাকায় অবস্থান করবে। নিজ এলাকার ভিতরে অবস্থান করলে গরিব বা অভাবী বলে গণ্য করা হবে, নিঃসহায় পথচারি নয়।

[২৮] সুরা বাকারা ২৭৩।

খ) কোন আইনসঙ্গত বা বৈধ উদ্দেশ্যে তাকে এলাকা ত্যাগ করতে হবে। অন্যথায় তাকে অর্থ প্রদান অন্যায় কাজে সমর্থন দেয়ার শামিল বলে গণ্য হবে।

গ) নিজ এলাকায় ধনী বলে গণ্য হলেও ভ্রমনকালে তার অর্থাভাব থাকতে হবে। নিঃসহায় পথচারী যাকাত পাওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে যদি তার অর্থ বিলম্বে প্রদেয় ঋণের আকারে অপরের কাছে পাওনা থাকে অথবা কারো কাছে পাওনা আছে কিন্তু ঐ প্রয়োজনের সময় ঋণগ্রহীতাকে ঐ স্থানে পাওয়া না যায় অথবা ঋণগ্রহীতা দেউলিয়া হয় অথবা ঋণগ্রহীতা তার ঋণ অস্বীকার করে।

প্রশ্ন: মা-বাবা, ছেলে-মেয়েকে যাকাত দেয়া যাবে কি?

উত্তরঃ না! মা-বাবা, ছেলে-মেয়েদের যাকাত দেয়া যাবে না। এক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে, যাকাতদাতার উসূল-ফুরু' অর্থাৎ "আপনি যাদের থেকে দুনিয়াতে এসেছেন অথবা আপনার থেকে যারা দুনিয়াতে এসেছে" তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না। আপনি যাদের থেকে এসেছেন বলতে আপনার উসূল অর্থাৎ আপনার পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, পরদাদা-পরদাদী, পরনানা-পরনানী এভাবে যত উপরে যাবে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর আপনার থেকে যারা দুনিয়াতে এসেছেন বলতে আপনার ফুরু' অর্থাৎ আপনার ছেলে-মেয়ে, নাতী-নাতনী, পুতী-পুতনী এভাবে যত নিচে যাবে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। এদের কাউকে যাকাত দেয়া যাবে না।

প্রশ্নঃ ভাই-বোন, মামা-খালা, চাচা-ফুফু ও তাদের সন্তান ও নিকটাত্মীয়দের যাকাত দেয়া যাবে কি?

উত্তরঃ হ্যাঁ! এদের সকলকে যাকাত দেয়া যাবে। কারণ এরা উপরোক্ত উসূল বা ফুরু' কোনটারই অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এরা যদি অভাবী হয় সেক্ষেত্রে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। কারণ তাতে একদিকে গরীবকে সাহায্য করা হয় অপর দিকে আত্মিয়তার বন্ধন রক্ষা করা হয়। হাদীসে আল্লাহ রাসূল সা: ইরশাদ করেছেন:

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

অর্থ: "সালমান ইবনে আমের (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন: মিসকিনকে সাদাকা দেয়া হলে শুধুমাত্র সাদাকার সওয়াব পাওয়া যাবে। আর আত্মিয়-স্বজনদের সাদাকা প্রদান করলে দুইটি সওয়াব পাওয়া যাবে একটি হলো সাদাকার সওয়াব আরেকটি হলো আত্মিয়তার বন্ধন রক্ষা করার সওয়াব।"[২৯]

প্রশ্ন: স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে কি?

উত্তর: স্বামী স্ত্রীকে যাকাত দিতে পারবে না। কেননা স্ত্রীর খোর-পোষ স্বামীর উপর ওয়াজীব। এক্ষেত্রে নিজের স্ত্রীকে যাকাত দেয়ার মাধ্যমে মূলত: নিজেই উপকৃত হয়। আর নিজের যাকাত দিয়ে নিজে ফায়াদা হাসীল করা যায়েজ নাই। পক্ষান্তরে স্ত্রী নিজ স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে কিনা সে বিষয়ে ওলামাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের এক মত অনুযায়ী স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে না। তাদের দলীল হলো: 'স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে যাকাত দিলে মূলত এর দ্বারা যাকাতদাতা নিজেই উপকৃত হয়। আর যাকাতদাতা নিজেই নিজের যাকাত দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়েজ নেই।'

তবে ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের এক মত হলো স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে। তাদের দলীল আবূ সায়ীদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসের নিম্নের অংশটি:

جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ ... قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নব আল্লাহর রাসূল সা: এর কাছে জানতে চাইল, হে আল্লাহর নবী! আপনি আজকে সাদাকা করার জন্য

[২৯] সুনানে তিরমিজি ৬৫৩; সুনানে নাসয়ী ২৫৮১; সুনানে ইবনে মাজাহ ১৮৪৪।

আদেশ করেছেন। আমার কিছু অলংকার ছিল আমি তা সাদাকা করতে চাইলে আমার স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন যে, তিনি এবং তার সন্তানরাই এই সাদাকা পাওয়ার বেশী উপযুক্ত। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সা: বললেন, হ্যাঁ! আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ঠিকই বলেছে। তোমার স্বামী ও তোমার সন্তানগণ তুমি যাদেরকে দান করবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হকদার।"[৩০]

তাছাড়া স্ত্রীর উপরে স্বামীর খোর-পোষ ওয়াজীব নয়। তাই এক্ষেত্রে স্ত্রী এবং অন্য মানুষ সমান। অন্য যে কোন মহিলা যেমন যে কোন পুরুষকে যাকাত দিতে পারে তেমনিভাবে নিজের স্ত্রীও স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে।

দলীল প্রমানের ভিত্তিতে ২য় মতটিই অধিক শক্তিশালী।

প্রশ্ন: কোন বিদআতী, ফাসেক অথবা যারা অন্যায় কাজে অর্থ ব্যয় করে তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে কি?

উত্তর: যে সকল মুসলিম যাকাত গ্রহণ করার উপযুক্ত তাদেরকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১) খাঁটি মুসলিম: কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামি শরিয়তের সম্পূর্ণ আনুগত্যশীল মুসলিম। এই প্রকার মুসলিম যদি যাকাত গ্রহণকরার উপযুক্ত হয় তাহলে তাদেরকে সর্বসম্মতিক্রমে যাকাত প্রদান করা যায়েজ।

২) চরম বিদআ'তী মুসলিম: অর্থাৎ যারা এমন বিদআ'তে লিপ্ত যেগুলো ইসলাম থেকে মানুষকে খারিজ করে দেয়। এই প্রকার বিদআ'তীদেরকে সর্বসম্মতীক্রমে যাকাত দেয়া যায়েজ নাই। কেননা তারা এই বিদআ'তের মাধ্যমে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে। আর কাফেরদেরকে যাকাতের মাল দেয়া যায়েজ নাই।

৩) সাধারণ বিদআ'তী ও পাপাচারে লিপ্ত মুসলিম: যারা আক্বিদাগত বা আমলগত এমন কোন বিদআ'তে লিপ্ত নাই যার দ্বারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। অথবা এমন কোন সাধারণ মুসলিম যাদের আক্বিদাগত কোন সমস্যা নেই তবে আমলগত ত্রুটি আছে। এই প্রকার লোকদের ব্যাপারে

[৩০] সহীহ বুখারী ১৪৬২।

যদি ধারণা হয় যে তারা যাকাতের অর্থ নিজেদের বিদআত অথবা পাপকাজে ব্যয় করবে তাহলে তাদেরকে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী যাকাত দেয়া যায়েজ নাই। এজন্য ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা রঃ বলেছেন,

فَيَنْبَغِيْ لِلْاِنْسَانِ اَنْ يَتَحَرَّي بِزَكَاتِه اَلْمُسْتَحِقِّيْنَ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِيْنِ وَ الْغَارِمِيْنَ وَ غَيْرِهِمْ مِنْ اَهْلِ الدِّيْنِ الْمُتَّبِعِيْنَ لِلشَّرِيْعَةِ

অর্থ: " মুসলিমদের উচিত তারা তাদের যাকাতকে যাচাই-বাছাই করে গরীব, অভাবগ্রস্থ, ঋণগ্রস্থদের ও অন্যান্য হকদারদের মধ্য থেকে যারা শরিয়তের বিধান সঠিকভাবে মেনে চলে তাদেরকে প্রদান করা।"[৩১]

কেননা যারা বিদআ'ত করে অথবা অন্যায় করে তাদেরতো মুসলিমরা বর্জন করা ও ঘৃণা করার মাধ্যমে শাস্তি দিবে। তাদেরকে তওবা করার জন্য আহবান করা হবে। তাহলে তাদেরকে যাকাত দিয়ে সাহায্য করা যায় কিভাবে?

এমনিভাবে যাদেরকে যাকাত দিলে আল্লাহর ইবাদতের কাজে ব্যয় করবে না তাদেরকেও যাকাত দেয়া উচিত নয়। কেননা আল্লাহ (সুব:) যাকাত ফরজ করেছেন তার ইবাদত করার ক্ষেত্রে সহযোগীতা করার জন্য। সুতরাং যারা সালাত আদায় করে না, আল্লাহর হুকুম পালন করে না তাদেরকে যাকাত না দেয়া উচিত যাতে তারা তওবা করে এবং সালাত আদায়ে পাবন্দি করে।

মোটকথাঃ যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে দীনদ্বার, সঠিক আক্বিদাহ ও আমলের অনুসারী, তাওহীদবাদী, মুমিন-মুসলিমদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। একারণেই আল্লাহ সুব: বলেন:

{لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}

অর্থ: "বিশেষ করে এমন সব গরীব লোক সাহায্য লাভের অধিকারী, যারা আল্লাহর কাজে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টা চালাতে পারে না এবং তাদের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে স্বচ্ছল বলে মনে করে।

[৩১] আল ফাতাওয়া ২৫/৮৭।

তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের ভেতরের অবস্থা জানতে পারো। তারা মানুষের কাছে পীড়াপীড়ি করে নাছোড়বান্দা হয়ে প্রার্থণা করে না।"[৩২]

এ আয়াকে আল্লাহ সুবঃ ঐসকল দ্বীনদার, পরহেজগার, মুমিন-মুসলিমদেরকে খুজে বের করে যাকাত দেয়ার জন্য হুকুম দিচ্ছেন যারা অভাব-অনাটনের কারণে অনাহারে-অর্ধাহারে মানবেতর জীবন যাপন করে, তবুও কারও কাছে ধর্ণা দেয় না। নিজের অভাবের কথা প্রকাশ করে না। এমনকি তার চাল-চলন, লেবাস-পোষাক, আচার-ব্যবহার দ্বারাও তার আভ্যন্তরীন অসহায় অবস্থা অনুভব করা যায় না। বরং বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদেরকে স্বচ্ছল বলেই মনে হয়। এককথায় একজন গরীব ভদ্রলোক। এধরণের লোকদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে যাকাত দেয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ সৈয়দ বংশ বা রাসূলুল্লাহ সাঃ এর বংশের লোকদেরকে যাকাত দেয়া যাবে কি?

উত্তরঃ না! রাসূলুল্লাহ সাঃ এর বংশ বনু হাশেম অর্থাৎ আলী (রা:) এর বংশধর, আ'কিলের বংশধর, জাফরের বংশধর, আব্বাস (রা:) এর বংশধর, হারেসের বংশধর এদেরকে সর্বসম্মতিক্রমে যাকাতের মাল দেয়া যাবে না। এমনিভাবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী মুত্তালেবের বংশধরগণও রাসূলুল্লাহ সাঃ এর বংশধর হিসাবে গণ্য হবে এবং তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাঃ ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِى لآلِ مُحَمَّد. إِنَّمَا هِىَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

অর্থ: "নিশ্চয়ই এই সাদাকাহ মুহাম্মদ সাঃ এর পরিবাবের জন্য উচিত নয় কেননা অবশ্যই ইহা মানুষের ময়লা।[৩৩]

এ হাদীসে মানুষের ময়লা বলার কারণ হচ্ছে যেহেতু যাকাতের মাধ্যমে অবশিষ্ট মালের এবং নফসের পবিত্রতা অর্জণ হয় তাই যাকাতের অংশটিকে ময়লা বলা হয়েছে। তাছাড়া অপর হাদীসে উল্লেখ হয়েছে:

أَنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

[৩২] সুরা বাকারা ২৭৩।

[৩৩] সহীহ মুসলিম ২৫৩০; সুনানে আবু দাউদ ২৯৮৭; সুনানে নাসায়ী ২৬০৮।

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, আমাদের জন্য সাদাকাহ হালাল কর হয় নি।"[৩৪]

অপর আরেক হাদীসে উল্লেখ আছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ كِخْ كِخْ أَمَا تَعْرِفُ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ (صحيح البخاري)

অর্থ: " আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হাসান ইবনে আলী (রা:) একবার সাদাকার খেজুর নিল এবং তা মুখে পুরে ফেলল। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সা: বললেন, কিখ! কিখ! (অর্থাৎ তাকে মুখ থেকে ফেলে দেয়ার জন্য বললেন) তুমি কি জান না যে, আমরা সাদাকার খাই না।[৩৫]

উপরের হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সা: এর পরিবারবর্গের উপর সাদাকার মাল গ্রহণ করা যায়েজ ছিল না।

তবে আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা র: এর মতে, বনু হাশেমের যাকাত বনু হাশেম গ্রহণ করতে পারবে অন্য লোকদের যাকাত গ্রহণ করতে পারবে না। এ মতটি ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসূফ র: থেকেও বর্ণিত।

প্রশ্ন: সরকারী যাকাত ফান্ডে যাকাত দেয়া যাবে কি?

উত্তর: বর্তমানে বিভিন্ন মুসলিম দেশে বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে সরকারীভাবে একটি যাকাত ফান্ড গঠন করা হয়। আর সে জন্য কিছু সরকারী আলেমদের মাধ্যমে একটি যাকাত বোর্ড গঠন করা হয়। যারা সাধারণ মানুষকে সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখ করে সরকারী যাকাত ফান্ডে যাকাত দেয়ার জন্য জনগনকে উদ্বুদ্ধ করে। মূলত: যাকাত আদায় করার দায়িত্বই ছিল সরকারের। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব: মুমিন শাসকদের মৌলিক চারটি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে দ্বিতীয়টি হচ্ছে যাকাত। যেমন ইরশাদ হচেছ:

[৩৪] সহীহ মুসলিম ২৫২৩; সুনানে আবু দাউদ ১৬৫২।

[৩৫] সহীহ বুখারী ৩০৭২; সহীহ মুসলিম ২৫২২।

{الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [الحج: ٤١]

অর্থ: তারা (মুমিনরা) এমন যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে।[৩৬]

এ আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে তারা সালাত কায়েম করবে। তারপরে যাকাত আদায় করার কথা বলা হয়েছে। এর রহস্য হচ্ছে, সালাতের মাধ্যমে তাদের মনের ভিতরে আল্লাহর ভয় ঢুকবে। তারা আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করবে। থানায় ওসি পুলিশের ইমামতি করবে, ডিসি অফিসে ডিসি। এস, পি অফিসে এস, পি। সংসদে স্পিকার। মন্ত্রিপরিষদে প্রধানমন্ত্রী। আদালতে প্রধান বিচারপতি। বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট। এভাবে যদি রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সালাত কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করা হয় তখনই কেবলমাত্র তাদেরকে বিশ্বাস করে তাদের হাতে যাকাতের মাল তুলে দেয়া যায়। কারণ যে ওসি পুলিশের ইমামতি করবে সে তার অধিনস্ত পুলিশদের থেকে আর ঘুষ চাইতে পারবে না। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রথম শর্ত পূরণ করলো না তৃতীয় ও চতুর্থ শর্তের কোন খবর নেই তখন শুধুমাত্র দ্বিতীয়টার জন্য বোর্ড গঠন করা এটাকি সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ নয়? তাছাড়া যে সরকার বারবার দূর্ণীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তাদের হাতে যাকাতের মাল তুলে দেয়া শিয়ালের কাছে মুরগি বর্গা দেয়া বা ডাকাতের ঘাটে নৌকা ভিড়ানোর মতো নয় কি?

মূলত: সরকারের কিছু পা চাটা গোলাম, দরবারি আলেমরা নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এ জাতীয় ফতওয়া ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে। নতুবা যে সরকার কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা করে না, সাংবিধানিকভাবে আল্লাহর স্বার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে না, আদালতে আল্লাহর আইন-বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করে না বরং আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে জনগনের স্বার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী, মূর্তি তৈরি করা ও সংরক্ষণ করা যাদের প্রধান কাজ, আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে গনতন্ত্রই যাদের

[৩৬] সূরা হজ্জ ৪১।

মুক্তির মূলমন্ত্র। যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার পরিবর্তে সুদভিত্তিক অর্থনীতিই যাদের মূলনীতি তাদের কাছে যাকাতের অর্থ তুলে দেয়া যাকাতকে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল করা, উপহাস করা ও মজাক করার শামীল। সুতরাং মুমিনদের জন্য সরকারের যাকাত তহবিলে যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

প্রশ্ন: প্রতি রমজানে পত্র-পত্রিকায় ও ব্যানারে যাকাতের লুঙ্গি-শাড়ী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেখা যায়। যাকাতের লুঙ্গি-শাড়ী বলতে কিছু আছে কি?

উত্তর: পূর্বের আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যাকাত হচ্ছে ধনীদের সম্পদে গরীব ও অসহায় মানুষের আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অধিকার। আল্লাহ সুব: ইরশাদ করেন:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاريات: ١٩)

অর্থ: "আর তাদের সম্পদে রয়েছে প্রার্থী এবং বঞ্চিতদের অধিকার।"[৩৭]

সুতরাং ধনীদের দায়িত্ব হলো গরীবদের প্রাপ্য তাদের হাতে পৌছে দেয়া। কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা পাতলা সুতা আর কাঁচা রং দিয়ে নিম্নমানের কাপড়-চোপড় তৈরী করে অথবা সারাবছরের অচল কাপড়-চোপড়গুলোকে চালিয়ে দেয়ার জন্য যাকাতকে নিয়ে এধরণের হাস্যকর ব্যবাসায় মেতে ওঠে। আবার এই সুযোগে কিছু রাজনৈতিক নেতারা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করে যাকাতের লুঙ্গি-শাড়ী বিতারণের নামে অসহায়-গরীব মানুষদেরকে জড় করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। এর মাধ্যমে এক দিকে যাকাতের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করা হয় অপরদিকে গরীব মানুষদের কষ্ট দেয়া হয়। এগুলো মুসলিমদের বর্জণ করা উচিত।

প্রশ্ন: হিসাব ব্যতিত যাকাত আদায় করলে যাকাত আদায় হবে কি?

উত্তর: অনেকেই হিসাব ব্যতিতই লাম-ছামভাবে কিছু যাকাত আদায় করে থাকে। হিসাব-নিকাশ ব্যতিত যতটাকাই আদায় করা হোক না কেন তা যাকাত বলে আদায় হবে না। বরং সাধারণ দান হিসাবে গন্য হবে। অবশ্য

[৩৭] সুলা যারিয়াত ৫১:১৯।

কেউ যদি যাকাতের নিয়্যাতে কিছু টাকা দান করলো কিন্তু পরে হিসাব-নিকাশ করে সমন্বয় করলো তবে সে ক্ষেত্রে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। হিসাব-নিকাশ ব্যতিত দান করলে যাকাত আদায় না হওয়ার কারন হলো, যাকাত ধনীদের মালের মধ্যে গরীবদের একটি নির্দিষ্ট পাওনা অধিকার। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়াল ইরশাদ করেন:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (المعارج: ٢٤)

অর্থ: "আর যাদের ধন–সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত হক।"[৩৮]

প্রশ্ন: এক এলাকার যাকাত অন্য এলাকায় স্থানান্তর করা জায়েজ আছে কি?

উত্তর: যাকাত ইসলামি দেশগুলোতে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠার অন্যতম ভিত্তি। সত্যধর্ম ইসলামের প্রকৃত অবস্থা ও মৌলিক দিকসমূহ তুলে ধরার জন্য এ হাতিয়ার প্রয়োগ করা উচিত। দখলদারদের কবল থেকে কোন ইসলামি ভূমি মুক্ত করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যবহার করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সুন্নাহ এবং তার সহচরদের ভূমিকা থেকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, যাকাতের অর্থ যে এলাকা থেকে আদায় করা হবে সে এলাকার গরিবদের মধ্যেই প্রাথমিকভাবে বিতরণ করা হবে। উদ্বৃত্ত তহবিল অন্য শহরে স্থানান্তর করা যাবে। তবে দুর্ভিক্ষ বা দুর্যোগ কবলিত এলাকায় বসবাসকারী কিংবা দুর্গত অবস্থায় পতিতরা ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে যাকাত স্থানান্তরের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

যাকাত স্থানান্তরের নিয়মাবলী:

প্রথমতঃ যাকাতের অর্থ যে এলাকা থেকে আদায় করা হয়েছে প্রাথমিকভাবে সে এলাকার গরিবদের মধ্যেই বিতরণ করা উচিত, যাকাতদাতার নিজের বসবাসের এলাকায় নয়, তবে সুনির্দিষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে যাকাতের অর্থ অন্য এলাকায় স্থানান্তর করা যাবে।

যাকাত স্থানান্তরের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো হলো ঃ

ক) জিহাদ অর্থাৎ আল্লাহর পথে যুদ্ধরতদের এলাকায় যাকাত স্থানান্তর।

[৩৮] সুরা মাআরিজ ৭০:২৪।

খ) ইসলাম প্রচার, শিক্ষা বিস্তার এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ যেগুলো যাকাত বিতরণের আটটি খাতের অন্যতম হিসাবে যাকাত পাওয়ার যোগ্য সেসব ক্ষেত্রে যাকাত স্থানান্তর করা যাবে।

গ) দুর্ভিক্ষ এবং দুর্যোগ কবলিত মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় যাকাত স্থানান্তর করা যাবে।

ঘ) যাকাতদাতার আত্মীয়কে (যে যথার্থই যাকাত পাওয়ার যোগ্য) যাকাত স্থানান্তর করা যাবে।

দ্বিতীয়তঃ পূর্বে উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলো ছাড়া অন্য কোন এলাকায় যাকাত স্থানান্তর করা হলে যাকাত প্রদান অকার্যকর হয়ে যাবে না, তবে যাকাতগ্রহীতা আটটি খাতের অন্তর্ভুক্ত কেউ না হলে কাজটি হবে মাকরুহ বা নিন্দনীয়।

তৃতীয়ত ঃ যাকাতের এলাকা পরিধি হচ্ছে: সংশ্লিষ্ট যাকাতদাতার বসবাসের এলাকার সংলগ্ন গ্রামসমূহ এবং অনধিক ৮২ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকা।

চতুর্থত ঃ স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় অনুমোদন যোগ্য কাজসমূহ ঃ

ক) যাকাতের শর্তাবলি পূরণ হলে যাকাতের সময় উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই যাকাত প্রদান করা যাবে এবং যাকাতগ্রহীতাদের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেয়া যাবে, যাতে সঠিক সময়ে যাকাত তাদের হাতে পৌঁছে।

খ) যাকাতদাতা যদি সঠিক সময়েই যাকাত প্রদান করেন, কিন্তু নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়ার পর যাকাতগ্রহীতাদের হাতে পৌঁছে, তার জন্য যাকাতদাতাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। কারণ যাকাত তার হকদারদের হাতে পৌঁছার পথে ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রশ্নঃ যাকাত কি শুধুমাত্র উম্মতে মুহাম্মদী এর উপর ফরজ না পূর্বের অন্যান্য উম্মতের উপরও ফরজ ছিল?

উত্তরঃ যাকাত শুধুমাত্র এই উম্মতের উপর ফরজ এমন নয় বরং পূর্ববর্তী উম্মতের উপরও ফরজ ছিল। পবিত্র কুরআনে এই বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।

ইব্রাহীম আঃ এর সন্তানদের যাকাত প্রদান করার আদেশ

আল্লাহ (সুবঃ) ইব্রাহীম আঃ এর সন্তানদেরকে অর্থাৎ ইসহাক ও ইয়াকূব আঃ কে যাকাত প্রদানের আদেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

{وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ} [الأنبياء: ٧٣]

অর্থঃ "আর তাদেরকে (ইব্রহীম আঃ এর সন্তান ইসহাক ও ইয়াকূবকে) আমি নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাত। আমি তাদের প্রতি সৎকাজ করার, সালাত কায়েম করার এবং যাকাত প্রদান করার জন্য ওহী প্রেরণ করেছিলাম। আর তারা আমারই ইবাদাত করত।"[৩৯]

এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে ইব্রাহীম আঃ এর যুগেও যাকাতের বিধান ছিল।

ইসমাঈল আঃ এর পবিবারের উপর যাকাত প্রদানের আদেশ

আল্লাহ (সুবঃ) পবিত্র কুরআনে ইসমাঈল আঃ এর ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি তার পরিবারকে যাকাত প্রদানের আদেশ করতেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

{وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا} [مريم: ٥٥]

অর্থঃ "আর সে (ইসমাঈর আঃ) তার পরিবার–পরিজনকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষপ্রাপ্ত।"[৪০]

---

[৩৯] সুরা আম্বিয়া ৭৩।

[৪০] সুরা মারইয়াম ৫৫।

মুসা আঃ এর কওমের প্রতি যাকাতের নোটিশ

আল্লাহ (সুবঃ) মুসা আঃ এর কওমের প্রতি যাকাতের প্রদানের নোটিশ পাঠিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ} [المائدة: ١٢]

অর্থ: "আর অবশ্যই আল্লাহ বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন দলনেতা পাঠিয়েছিলাম এবং আল্লাহ বলেছিলেন, **নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি, যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর,** আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আন, তাদেরকে সহযোগিতা কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মুছে দেব। আর অবশ্যই তোমাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। তোমাদের মধ্য থেকে এরপরও যে কুফরী করেছে, সে অবশ্যই সোজা পথ হারিয়েছে।"[৪১]

ঈসা আঃ এর প্রতি যাকাতের নির্দেশ

কুরআনুল কারীমে আল্লাহু সুবঃ ঈসা আঃ কে এবং তার উম্মতদেরকেও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا}

অর্থ: "আর যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে সালাত ও যাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন'।"[৪২]

---
[৪১] সুরা মায়েদা ৫:১২।
[৪২] সুরা মারইয়াম ১৯:৩১।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা গেল যে, যাকাত শুধুমাত্র আমাদের প্রতিই ফরজ করা হয়েছে তা নয় পূর্ববর্তী উম্মতের প্রতিও যাকাত ফরজ করা হয়েছিল।

প্রশ্ন: যাকাত আদায় না করার ভয়াবহ পরিনতি কি ?

উত্তর: যাকাত আদায় না করার শাস্তি প্রথমত দুই ধরণের হতে পারে। ১. ইহকালিন শাস্তি।
২. পরকালিন শাস্তি।

ইহকালিন শাস্তি আবার দুই রকম। আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি ও ইসলামিক প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রদত্ত শাস্তি।

আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি

যারা যাকাত আদায় করা থেকে বিরত থাকে এবং তার মালের মধ্য থেকে আল্লাহর হক এবং গরীবদের হক আদায় করা থেকে কৃপণতা করে আল্লাহ সুবঃ তাদেরকে দুনিয়াতেই অনবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষতে আক্রান্ত করবেন। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন:

عن بريدة ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين وفي رواية الا حبس عنهم القطر (الطبراني فى الأوسط)

অর্থ: "বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ ইরশাদ করেন, যখন কোন জাতি যাকাত আদায় না করে তখন আল্লাহ সবঃ তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টিতে আক্রান্ত করেন।"[৪৩]

ইসলামী প্রসাশনের পক্ষ থেকে শাস্তি

যদি তারা ইসলামী সরকারের নিয়ন্ত্রনে থাকে তবে তাদের থেকে জোড়পূর্বক যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (صحيح البخاري)

---
[৪৩] তাবরানী ৪৫৭৭। ইমাম হাইসামি রঃ বলেন এই হাদীসের রাবী সকলেই সিকাহ।

অর্থ: “আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন, আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষন না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই ও মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর রাসূল, আর সালাত কায়েম করে ও **যাকাত প্রদান করে** । তারা যদি এ কাজগুলো করে, তবে আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করল; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে (যেমান: কিসাস, রজম ইত্যাদি), তাহলে স্বতন্ত্র কথা । আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর ন্যস্ত ।”[৪৪]

এ হাদীসে “অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে তাহলে স্বতন্ত্র কথা” বলে স্পষ্ট করে দেয়া হলো যে, ইসলাম গ্রহণ করার পরেও ইসলামের কোন বিধান অমান্য করার কারণে তার জান-মালের নিরাপত্তা বাতিল হতে পারে । আর সেই বিধানেরই একটি হচ্ছে যাকাত । একারণেই আবূ বকর সিদ্দীক (রা:) সাহাবায়ে কিরামদের উপস্থিতিতে ঘোষনা করেছিলেন:

الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا

অর্থ: “ যাকাত হল মালের হক । আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি বক্‌রির বাচ্চাও না দেয় যা তারা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে দিত । তাহলে তা না দেওয়ার কারণে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব ।”[৪৫]

আর যদি তারা ইসলামী প্রসাশনের নিয়ন্ত্রনের বাহিরে থাকে তাহলে সরকারের দয়িত্ব হলো তাদের সাথে যুদ্ধ করা । কেননা সাহাবায়ে কিরামগণ তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করেছেন । এ হচ্ছে যাকাত আদায় না করলে তার পার্থিব বা ইহকালিন শাস্তি । আর আখেরাতের শাস্তি নিম্নে প্রদত্ত হলো ।

যাকাত আদায় না করলে আখেরাতের শাস্তি

যাকাত আদায় না করলে আখেরাতের শাস্তির ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে । তার কিছু অংশ তুলে ধরা হলো:

[৪৪] সহীহ বুখারী ২৪ ।
[৪৫] সহীহ বুখারী ৬৪৫৬ ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

{ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة : ٣٤ ، ٣٥]

অর্থ: “ যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও । যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেয়া হবে । (আর বলা হবে) ‘এটা তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর’ ।”[৪৬]

এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন كنز বা পুঞ্জিভূত সম্পদ হলো ঐ সম্পদ যার যাকাত আদায় করা হয়নি । হাদীস:

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا (صحيح البخاري)

অর্থ: “খালেদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) সাথে বের হলাম, এমন সময় এক গ্রাম্য ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ‘ আমাকে আল্লাহর (সুব:) বাণি: “ যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না” এর সম্পর্কে বলুন (এই আয়াতে পুঞ্জিভূত সম্পদ বলতে কি বুঝানো হয়েছে) । আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বললেন যেই ব্যক্তি সম্পদ জমা করে কিন্তু তার যাকাত আদায় করে না তার কথা বলা হয়েছে ।[৪৭]

[৪৬] সুরা তাওবা ৩৪-৩৫ ।
[৪৭] সহীহ বুখারী ১৪০৪ ।

হাদীসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সা: ইরশাদ করেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَيْهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا { وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [آل عمران: ١٨٠]

অর্থ: "আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন: যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে (বিষের তীব্রতার কারণে) টেকো মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। তারপর রাসূলুল্লাহ সা: তিলাওয়াত করলেন, " আল্লাহ সুব: যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পন্য করছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যান বয়ে আনবে, বরং উহা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। অচিরেই কিয়ামত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃংখলাবদ্ধ করা হবে।" [৪৮] অপর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِىَ عَلَيْهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ

[৪৮] সহীহ বুখারী ১৩২১;

قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

অর্থ: "আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেনঃ যেসব ধনাঢ্য ব্যক্তি নিজেদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করে না কিয়ামতের দিন তাদের এ সম্পদ দোযখের আগুনে গরম করে পাত তৈরী করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের দেহের উভয় পার্শ্ব ও ললাটে দাগ দেয়া হবে। তার শাস্তি বান্দাদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। এ সময়কার একটি দিনের পরিমান হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর কেউ তার পথ ধরবে জান্নাতের দিকে আর কেউ ধরবে জাহান্নামের দিকে। আর যেসব উটের মালিকেরা যাকাত আদায় করবে না তাদেরকে একটি সমতল মাঠে উপুড় করে শুইয়ে রাখা হবে এবং ঐসব উট স্থুল দেহ নিয়ে আসবে যেমনটি তারা পৃথিবীতে ছিল এবং এগুলো তাদেরকে পা দিয়ে মাড়াতে মাড়াতে অগ্রসর হবে। এভাবে যখনই এর শেষ দলটি অতিক্রম করবে পুনরায় এর প্রথম দল এসে পৌছবে। এগুলো এভাবে তাদেরকে মাড়াতে থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ (সুব:) তাঁর বান্দাদের বিচার শেষ না করবেন। আর এ কাজ এমন এক দিনে করা হবে যা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। অতঃপর কেউ তার পথ ধরবে- হয় জান্নাতের দিকে না হয় জাহান্নামের দিকে। আর যেসব ছাগলের মালিকরা তার যাকাত আদায় করবে না তাদেরকে একটি সমতল মাঠে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে এবং তার সে ছাগলগুলো মোটাতাজা অবস্থায় যেমনটি পৃথিবীতে ছিলো- এসে তাদের খুর দিয়ে মাড়াবে এবং শিং মারতে মারতে অগ্রসর হবে। অথচ সেদিন কোন একটি ছাগলই শিং বাঁকা, শিংহীন বা শিং ভাঙ্গা হবে না। যখন এদের শেষ দল অতিক্রম করবে পুনরায় প্রথম দল এসে পৌঁছবে। আর এভাবে আযাব চলতে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ সুব: তাঁর বান্দাদের বিচার সমাপ্ত করেন। এ শাস্তি এমন এক দিনে হবে যার পরিমান হবে তোমাদের হিসাবানুসারে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর কেউ তার পথ ধরবে জান্নাতের দিকে আর কেউ ধরবে জাহান্নামের দিকে।"[৪৯]

[৪৯] সহীহ মুসলিম ২৩৩৯।

জাহান্নামে যাওয়ার মৌলিক কারণগুলোর অন্যতম হলো যাকাত আদায় না করা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

{ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} [المدثر: ٤٢ – ٤٤]

অর্থ: " কিসে তোমাদেরকে (পাপীদেরকে) জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাল? তারা বলবে, 'আমরা সালাত আদায়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না' । 'আর আমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করতাম না' ।[৫০]

যাকাত আদায় না করলে জান-মালের নিরাপত্তা থাকে না

একারণেই প্রথম খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রা:) যাকাত অস্বিকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন ।

عن هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

অর্থ: আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা:) এর ওফাত হল এবং আবূ বকর (রা:) খলীফা নিযুক্ত হলেন আর আরবের যারা কাফির হল, তখন ওমর (রা:) বললেন, হে আবূ বকর! আপনি কিভাবে লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন? অথচ রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) বলবে । আর যে কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে যথার্থ কারণ না থাকলে সে তার জান-মাল আমার হাত থেকে রক্ষা করে নেয় । আর তার হিসাব আল্লাহর

[৫০] সুরা মুদ্দাস্‌সীর ৪২-৪৪ ।

দায়িত্বে । আবূ বকর (রা:) বললেন, আল্লাহর কসম! যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে প্রভেদ করবে তাদের সাথে অবশ্যই আমি যুদ্ধ করব । কেননা, যাকাত হল মালের হক । আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি বক্‌রির বাচ্চাও না দেয় যা তারা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে দিত । তাহলে তা না দেওয়ার কারণে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব । ওমর (রা:) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝতে পারলাম যে, এটা আর কিছু নয় এবং আল্লাহ আবূ বকর (রা:) এর বক্ষ যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন । পরে আমি বুঝতে পারলাম যে, এটি-ই হক (আবূ বকর (রা:) এর সিদ্ধান্ত) ।[৫১]

একারণেই যখন আবু বকর (রা:) খলিফা নিযুক্ত হলেন এবং নানা ধরণের সমস্যার সাথে একদল মুসলিম যাকাত দিতে অস্বীকার করে বসল । তখন আবু বকর (রা:) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

অর্থ: আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা:) এর ওফাত হল এবং আবূ বকর (রা:) খলীফা নিযুক্ত হলেন আর আরবের যারা কাফির হল, তখন ওমর (রা:) বললেন, হে আবূ বকর! আপনি কিভাবে লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন? অথচ রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) বলবে । আর যে কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে যথার্থ কারণ না থাকলে সে তার

[৫১] সহীহ বুখারী ৬৪৫৬ ।

জান-মাল আমার হাত থেকে রক্ষা করে নেয় । আর তার হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে । আবূ বকর (রা:) বললেন, আল্লাহর কসম! যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে প্রভেদ করবে তাদের সাথে অবশ্যই আমি যুদ্ধ করব । কেননা, যাকাত হল মালের হক । আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি বক্‌রির বাচ্চাও না দেয় তা তারা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে দিত । তাহলে তা না দেওয়ার কারণে তাদের সাথে যুদ্ধ করব । ওমর (রা:) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝতে পারলাম যে, এটা আর কিছু নয় এবং আল্লাহ আবূ বকর (রা:) এর বক্ষ যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন । পরে আমি বুঝতে পারলাম যে, এটি-ই হক (আবূ বকর (রা:) এর সিদ্ধান্ত) ।[৫২]

{ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ } [التوبة : ٣٤ ، ٣٥]

অর্থ: " যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও । যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেয়া হবে । (আর বলা হবে) 'এটা তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর' ।"[৫৩]

এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন كنز বা পুঞ্জিভূত সম্পদ হলো ঐ সম্পদ যার যাকাত আদায় করা হয়নি । হাদীস:

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا

[৫২] সহীহ বুখারী ৬৪৫৬ ।
[৫৩] সুরা তাওবা ৩৪-৩৫ ।

অর্থ: "খালেদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) সাথে বের হলাম, এমন সময় এক গ্রাম্য ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ' আমাকে আল্লাহর (সুব:) বাণি: " যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না" এর সম্পর্কে বলুন (এই আয়াতে পুঞ্জিভূত সম্পদ বলতে কি বুঝানো হয়েছে) । আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বললেন যেই ব্যাক্তি সম্পদ জমা করে কিন্তু তার যাকাত আদায় করে না তার কথা বলা হয়েছে ।[৫৪]

প্রশ্ন: যাকাত আদায় করলে আমাদের লাভ কি?

উত্তর: যাকাতের বিনিময়ে আল্লাহ সুব: নিম্নোক্ত পুরুষ্কারসমূহ দান করবেন ।

যাকাতদাতার জান-মালের পরিশুদ্ধি হয়

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব: ঘোষণা দিচ্ছেন:

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة : ١٠٣]

অর্থ: " তাদের সম্পদ থেকে 'সাদাকা' নাও । এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি **পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে** । আর তাদের জন্য দো'আ কর, নিশ্চয় তোমার দো'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর । আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ।"[৫৫]

যাকাতদাতার মাল বৃদ্ধি পায়

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ঘোষনা দিয়েছেন:

{ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٦١]

অর্থ: " যারা আলাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ' দানা । আর আলাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন । আর আলাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ ।"[৫৬]

[৫৪] সহীহ বুখারী ১৪০৪ ।
[৫৫] সুরা তাওবা ১০৩ ।
[৫৬] সুরা বাকারা ২৬১ ।

অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করছেন:

{وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: ٢٦٥]

অর্থ: "আর যারা আলাহর সন্তুষ্টি লাভ ও নিজদেরকে সুদৃঢ় রাখার লক্ষ্যে সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা উঁচু ভূমিতে অবস্থিত বাগানের মত, যাতে পড়েছে প্রবল বৃষ্টি। ফলে তা দ্বিগুণ ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছে। আর যদি তাতে প্রবল বৃষ্টি নাও পড়ে, তবে হালকা বৃষ্টি (যথেষ্ট)। আর আল্লাহ তোমরা যা আমল কর, সে ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা।"[৫৭]

এখানে প্রবল বৃষ্টিপাত বলতে এমন দান-খয়রাতকে বুঝানো হয়েছে যার পেছনে থাকে চরম কল্যাণাকাংখা ও পূর্ণ সদিচ্ছা। আর হালকা বৃষ্টিপাত বলতে কল্যাণাকাংখার তীব্রতা বিহীন দান-খয়রাতকে বুঝানো হয়েছে।

রাসূল সা: হাদীসে ইরশাদ করেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

অর্থ: " আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজের পবিত্র (হালাল) উপর্জন থেকে একটি খেজুর পরিমান দান করল আর আল্লাহর কাছে পবিত্র জিনিষই গৃহীত হয়, আল্লাহ সুব: ঐ দানকে নিজ ডান হস্তে কবুল করেন। অত:পর উহাকে দানকারীর জন্য লালন-পালন করতে থাকেন যেরকমভাবে তোমরা একেক জন তার বকরীর বাচ্চাকে লালন-পালন কর অত:পর উহা পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়। (মুসলিমের রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে যে তা পাহাড়ের চেয়েও বেশী হয়)[৫৮]

[৫৭] সুরা বাকারা ২৬৫।
[৫৮] সহীহ বুখারী ৭৪২৯; সহীহ মুসলিম ২৩৯০।

আল্লাহ সুব: কে ঋণ দেওয়া হয় যা বহুগুনে বৃদ্ধি করে পরিশোধ করা হবে

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ}

অর্থ: " যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তিনি **তা তোমাদের জন্য দ্বিগুন করে দিবেন** এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, পরম ধৈর্যশীল।"[৫৯]

এ আয়াতে দ্বিগুন বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী আয়াতে বহুগুনে বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। মূলত: এগুলো নির্ভর করে দাতার এখলাস, আন্তরিকতা ইত্যাদির উপর। যার এখলাস বেশী আল্লাহ সুব: তাকে বহু বহুগুনে বৃদ্ধি করে দিবেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে:

{ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [البقرة: ٢٤٥]

অর্থ: "কে আছে, যে আলাহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে **তিনি তার জন্য বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন?** আর আলাহ সুব: (তোমাদের সম্পদ) সংকীর্ণ করেন ও প্রসারিত করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরানো হবে।"[৬০]

আল্লাহ সুব: কে ঋণ দেয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর বান্দাদেরকে সাহায্য করা। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِى. قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِى فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِى عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِى. قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِى فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِى.

[৫৯] সুরা তাগাবুন ৬৪:১৭।
[৬০] সুরা বাকারা ২:২৪৫।

قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِى فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى

অর্থ: "আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সা: বলেছেন- আল্লাহ সুব: কিয়ামতের দিন বললেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম কিন্তু তুমি আমার পরিচর্যা কর নাই। বান্দা বলবে, হে আমার রব! আমি কিভাবে তোমার পরিচর্য়া করবো তুমিতো সমস্ত জগৎসমূহের প্রতিপালক? আল্লাহ তায়াল বলবেন, তুমি কি জানতে না যে আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল? অথচ তুমি তার পরিচর্যা কর নাই। যদি তুমি তার পরিচর্যা করতে তাহলে সেখানে আমাকে পেতে। আল্লাহ সুব: আবার বলবেন, হে বনি আদম! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম অথচ তুমি আমাকে খাবার দাওনি। বান্দা বলবে, হে আমার রব! আমি কিভাবে তোমাকে খাবার খাওয়াব তুমিতো জগতসমূহের রব। আল্লাহ (সুব:) বলবেন আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল। যদি তুমি তাকে খাবার দিতে তাহলে সেখানে আমাকে পেতে। আল্লাহ সুব: (তৃতীয়বার) বলবেন, হে বনী আদম! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পানি দাওনি। বান্দা বলবে, হে আমার রব! আমি কিভাবে আপনাকে পানি দিব আপনিতো জগতসমূহের রব। আল্লাহ (সুব:) বলবেন আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল কিন্তু তুমি তাকে পানি দাওনি। যদি তুমি তাকে পানি দিতে তাহলে সেখানে আমাকে পেতে।"[৬১]

এ হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ সুব: কে ঋণ দেয়ার অর্থ আল্লাহ বান্দাদেরকে সাহায্য করা নতুবা আল্লাহর কোন ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন নাই। কেননা আল্লাহ সুব: পবিত্র কুরআনে ঘোষনা দিয়েছেন:

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} [فاطر: ١٥]

অর্থ: "হে মানবজাতী! তোমরা সকলেই আল্লাহর দরবারে ফকির। আর শুধুমাত্র আল্লাহ সুব: ই ধনী এবং প্রসংশীত।[৬২]

[৬১] সহীহ মুসলিম ৬৭২১।
[৬২] সুরা ফাতের ১৫।

দারিদ্র বিমোচন হয়

দারিদ্র বিমোচনে ইসলামে যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম। পৃথীবির সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার জন্য আল্লাহ সুব: মানব জাতীকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এক: ধনী শ্রেণী। দুই: গরীব শ্রেণী। এর কতগুলো বিশেষ কারণ রয়েছে। নতুবা আল্লাহ সুব: ইচ্ছে করলে গোটা মানবজাতিকে এক স্তরে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ সুব: তা করেন নাই। এরকারণ আল্লাহ সুব: নিজেই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করছেন:

{ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَـــاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا [الزخرف: ٣٢]

অর্থ: " আমিই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দেই এবং তাদের একজনকে অপর জনের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে একে অপরকে অধিনস্থ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।"[৬৩]

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য সৃষ্টিগত। যাতে ধনীরা গরীবদেরকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারে। নতুবা সকলেই যদি ধনী হতো তাহলে মেথর, সুইপাড়, কুলি, মজদুর কোথায় পাওয়া যেত? তাছাড়া এর মাধ্যমে আল্লাহ সুব: মানুষদেরকে পরিক্ষাও করছেন যে আল্লাহ সুব: যাদের নেয়ামত দান করেছেন তারা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে কিনা? পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ} [الأنعام: ١٦٥]

অর্থ: " আর তিনি সে সত্তা, যিনি তোমাদেরকে যমীনের খলীফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যা প্রদান করেছেন, তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন।"[৬৪]

বুঝা গেল আল্লাহ সুব: ধনী-দরিদ্রের এই পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন কারণে। কিন্তু এই গরীবদেরকে সাহায্য সহযোগীতা করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বর্তমানে বিভিন্ন এনজিও, রাজনৈতিক দল নিজেদেরকে গরীবের বন্ধু প্রচার করে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তণ করেছে ঠিকই। কিন্তু

[৬৩] সুরা যুখরুফ ৩২।
[৬৪] সুরা আনআ'ম ১৬৫।

গরীবদের কোন উপকারে আসে নাই। কিন্তু ইসলাম গরীবদের জন্য যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার ঘোষনা দিয়ে স্থায়ীভাবে ধনীদের মালের মধ্যে নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যদি সুপরিকল্পিতভাবে এই যাকাত আদায় করা হতো এবং বন্টন করা হতো তাহলে পৃথিবীতে ধনী-দরিদ্যের এই বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি হতো না।

যাকাতদাতার ইহকাল ও পরকালের ভয়ভীতি দুর হয়

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব: বলেন:

{الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: ٢٦٢]

অর্থ: "যারা আলাহর রাস্তায় তাদের সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর তারা যা ব্যয় করেছে, তার পেছনে খোঁটা দেয় না এবং কোন কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট তাদের প্রতিদান রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা চিন্তিত হবে না।"[৬৫]

যাকাতদাতাকে আল্লাহ সুবঃ জান্নাত দান করবেন।

পবিত্র কুরআনে যাকাত প্রদান করা জান্নাতবাসীদের কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ } [الذاريات: ١٥ - ١٩]

অর্থ: নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতসমূহে ও ঝর্ণাধারায়, তাদের রব তাদের যা দিবেন তা তারা খুশীতে গ্রহণকারী হবে। **ইতিপূর্বে এরাই ছিল সৎকর্মশীল**। রাতের সামান্য অংশই এরা ঘুমিয়ে কাটাতো। আর রাতের শেষ প্রহরে এরা ক্ষমা চাওয়ায় রত থাকত। **আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক**।[৬৬]

এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ করা হয়েছে:

[৬৫] সুরা বাকারা ২:২৬২।
[৬৬] সুরা যারিয়াত ১৫-১৯।

لَمَّا وَصَفَهُمْ بِالصَّلَاةِ ثَنَّى بِوَصْفِهِمْ بِالزَّكَاةِ

অর্থ: আল্লাহ (সুব:) জান্নাতবাসীদের বৈশিষ্টসমূহ বয়ান করতে গিয়ে যখন সালাতে কথা উল্লেখ করলেন তখন তার সাথে সাথেই যাকাতের কথাও উল্লেখ করেছেন।

যাকাতদাতা আল্লাহর রহমতের হকদার

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব: ইরশাদ করেছেন:

{ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٧١]

অর্থ: " আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৬৭]

প্রশ্ন: ইসলামী শরিয়তে যাকাতের গুরুত্ব ও অবস্থান কি?

উত্তর: যাকাত ইসলামের পঞ্চবেনার একটি। ঈমান এবং সালাতের পরই যাকাতের স্থান। কুরআনে বহু জায়গায় সালাত এবং যাকাতকে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষেরা মুখে মুখে বলে নামায, রোজা কিন্তু কুরআন হাদীসে নামাযের সাথে রোজাকে মিলানো হয় নাই বরং বলা হয়েছে সালাত-যাকাত। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ রহস্য রয়েছে। তা হল: সালাতে যখন আমীর-ফকীর, ধনি-দরিদ্র একত্রে দাড়াবে তখন ধনিরা গরীবের অবস্থা পর্যবেক্ষন করবে এবং তাদেরকে সাহায্য করতে উদ্বুদ্ধ হবে। একারণেই ইসলামের সালাত এবং যাকাতের গুরুত্ব মানুষের সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একারণেই কুরাআন-হাদীসে সালাতের পরই যাকাতকে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

[৬৭] সুরা তাওবা ৭১।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর একাত্বতা ঘোষণা করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমজানে সিয়াম পালন করা এবং হজ্জ করা।"[৬৮]

যাকাতের এই গুরুত্বের কারণেই আল্লাহর রাসুল (সা:) সাহাবায়ে কেরাম (রা:) থেকে যাকাতের জন্য বিশেষভাবে বাইয়াত নিতেন। জারির (রা:) থেকে বর্ণিত হাদীস:

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ: "জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সা:) এর নিকট সালাত কায়েম, যাকাত আদায় এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যামকামী হওয়ার ব্যাপারে বাইআত দিলাম।"[৬৯]

যাকাত অস্বিকারকারীদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ

যারা যাকাত আদায় করতে অস্বিকার করবে তাদের বিরূদ্ধে আল্লাহর রাসূল সা: কে আল্লাহ সুব: পক্ষ থেকে যুদ্ধ করার নির্দেশ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: ١١]

অর্থ: "অতএব যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং **যাকাত প্রদান করে,** তবে দীনের মধ্যে তারা তোমাদের ভাই।"[৭০]

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যাকাত আদায় না করলে তারা আমাদের মুসলিম ভাই হতে পারে না। এ কারণেই হাদীসে কাফেরদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করা বন্ধ

[৬৮] সহীহ মুসলিম ১৯ নং হাদীস; সহহি বুখারী ৮ নং হাদীস; সুনানে তিরমিজি ২৬০৯ নং হাদীস।
[৬৯] সহীহ বুখারী ১৪০৮।
[৭০] সুরা তাওবা ১১।

করার জন্য যে শর্তগুলো রয়েছে তার মধ্যে যাকাত অন্যতম। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন, আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষন না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই ও মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর রাসূল, আর সালাত কায়েম করে ও **যাকাত প্রদান করে**। তারা যদি এ কাজগুলো করে, তবে আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করল; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে (যেমান: কিসাস, রজম ইত্যাদি), তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর ন্যস্ত।[৭১]

প্রশ্ন: যাকাত কি কোন অনুকম্পা বা অনুগ্রহ না অধিকার?

উত্তর: না! যাকাত কোন অনুকম্পা নয়। বরং এটা ধনিদের মালের মধ্যে আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত গরীবের অধিকার। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ } [الذاريات: ١٩]

অর্থ: আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।[৭২]

মূলত: ইসলামের শুরুর দিকে গরীবরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করার এটিও একটি কারণ। কেননা তৎকালীন জাহেলী যুগে গরীবরা ধনীদের থেকে সুদে টাকা নিয়ে সে টাকা আদায় করতে না পেরে চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদের বোঝা তাদের মাথায় এমনভাবে চেপে বসেছিল যার থেকে মুক্তির কোন রাস্তা খোলা ছিল না। কারণ গরীবরা সুদে টাকা নিয়ে ব্যবসা-বানিজ্য, খেত-খামার করত। হালের বলদ কিনে কৃষি কাজ করতো।কোন বিপদ-আপাদ বা দুর্যোগের করণে ফসল নষ্ট হয়ে গেলে বা হালের বলদ মারা

[৭১] সহীহ বুখারী ২৪।
[৭২] সুরা যারিয়াত ১৯।

গেলে ধনীদের কোন ক্ষতি হতো না তারা তাদের পাওনা আদায়ের জন্য গরীবের ভিটে-মাটি, জমি-জমা, স্ত্রীর গহনা ইত্যাদি জোড়পূর্বক নিয়ে নিত। তা না পারলে গরীব লোকটিকে কৃতদাস বনিয়ে ফেলত। যেমন বর্তমানে এনজিওরা গরীবদেরকে সুদে টাকা দেয়। গরীবরা সে টাকা আদায় করতে না পারলে সেই বর্বর যুগের মতো গরীবদের জায়গা-জমি, ভিটে-মাটি, স্ত্রীর গহনা ইত্যাদি দ্বারা তাদের পাওনা আদায় করে নেয়। তা না পারলে জেলে ঢুকায়। অথবা হত্যা করে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে। এভাবে ধনীরা আরও ধনী হতে লাগল আর গরীবরা ফতুর (নিঃসহ) হতে লাগল। একটি কৌতুক মনে পড়ল: এক গরীব বেচারা শুনেছিল 'টাকায় টাকা টানে'। এজন্য সে ব্যাংকে গিয়ে ক্যাশে লক্ষ-কোটি টাকা দেখে নিজের পকেটের দশটি টাকা ঐ কোটি টাকার ভিতরে ছুড়ে মারে। এরপরে অপেক্ষা করতে থাকে যে ঐ দশ টাকায় কিছু টাকা টেনে আনে কিনা। কিন্তু এরই মধ্যে পুলিশ এসে তার কলার চেপে ধরে বলল: 'ব্যাটা তুই কি ডাকাত না ছিনতাইকারী'? লোকটি বলল, না! আমি কোনটিই না। পুলিশ বললো তাহলে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত এখানে দাড়িয়ে কি দেখছিস? লোকটি বলল, আমি শুনেছিলাম 'টাকায় টাকা টানে' তাই আমার পকেটের দশ টাকার নোটটি ঐযে ক্যাশে লক্ষ-কোটি টাকা রয়েছে ওখানে ছুড়ে মারলাম। দেখি আমার ঐ দশটাকার নোট ওখান থেকে কিছু টাকা টেনে আনে কিনা। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করা সত্ত্বেও কোন টাকাতো আনলই না বরং সে নিজেও ফিরে আসল না। এবারে পুলিশ হেসে বলল, তুমি ঠিকই শুনেছ যে, টাকায় টাকা টানে। তবে তা অল্প টাকায় বেশী টাকা নয় বরং বেশী টাকায় অল্প টাকাকে টেনে আনে। ঐযে ক্যাশের লক্ষ-কোটি টাকা তোমার দশ টাকাকে এমনভাবে টেনে ধরেছে যে, ওখান থেকে বের হয়ে আসার আর কোন সুযোগ নেই। এভাবেই গরীবর সবকিছু হারিয়ে অসহায় জীবন যাপন করছিলো ঠিক সেই মূহূর্তে কুরআনের এই বাণী তাদের নতুন দীগন্তের দ্বার উন্মোচন করে। গরীবরা যখন জানতে পারল যে ধনীদের সম্পদে তাদের অধিকার রয়েছে তখন তারা তা উদ্ধার করার জন্য দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত হতে শুরু করে। যার ফলে সত্যিই তারা একদিন তাদের অধিকার ফিরে পায়। শেষ পর্যন্ত যাকাত গ্রহণ করার মত লোক খুজে পাওয়া যেত না। ওমর বিন আবদুল আজিজ রঃ এর

খিলাফতকালে গোটা মদিনায় যাকাত গ্রহণ করার মতো কোন লোক খুজে পাওয়া যেত না। এটাই হচ্ছে যাকাত আর সুদের মধ্যে পার্থক্য। যাকাত মানে হচ্ছে ধনীদের থেকে নাও গরীবদেরকে দাও। আর সুদে ঋণ দেয়া মানে হচ্ছে গরীবদের থেকে নাও আর ধনীদেরকে দাও। যার বাস্তব প্রমান এদেশের এন,জি,ও কর্তৃক ঋণগ্রস্থ গরীব জনগোষ্ঠি। এজন্যই ইসলামে সুদকে চিরস্থায়ীভাবে হারাম করা হয়েছে এবং যাকাতকে ফরজ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: যাকাত আদায়ের সময় কোন কোন বিয়য়ে লক্ষ্য রাখা উচিত?

উত্তর: যাকাত আদায়ের সময় নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা উচিত।

ক) এখলাস অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং রিয়ামুক্ত অন্তরের যাকাত প্রদান করা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

{ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُــونَ }

অর্থ: "আর তোমরা তো আলাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় কর এবং তোমরা কোন উত্তম ব্যয় করলে তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। আর তোমাদের প্রতি যুল্ম করা হবে না।"[৭৩]

সকল ইবাদত কবুল হওয়ার জন্যই দু'টি শর্ত রয়েছে। এক: এখলাসুন নিয়্যত। দুই: ইত্তিবাউস্সুন্নাহ। প্রথম শর্ত পূরণ না হলে সেটি হবে শিরকযুক্ত ইবাদত। আর দ্বিতীয় শর্তটি পূরণ না হলে সেটি হবে বিদআ'ত। শিরক এবং বিদআ'তযুক্ত ইবাদত আল্লাহ সুব: এর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। একারণেই আল্লাহ সুব: এখলাসের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেছেন:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [البينة/٥]

অর্থ: "আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর 'ইবাদাত' করে তাঁরই জন্য দীনকে খালিস করে।"[৭৪]

---

[৭৩] সুরা বাকারা ২৭২।

[৭৪] সুরা বাইয়িনা ৫ নং আয়াত।

এই আয়াতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেকোন ইবাদতে শুধুমাত্র আল্লাহ (সুব:) এর নৈকট্য লাভের খালেস নিয়্যাত করতে হবে।
নিয়্যাত খাঁটি না হলে শিরক হয়। নিয়্যাতের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা:) পবিত্র হাদীসে ইরশাদ করেন:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

অর্থ: "ওমর ইবনে খাত্তার (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল।"[৭৫]

এ হাদীসেও রাসূলুল্লাহ (সা:) পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন যে, নিয়্যাত ছাড়া কোন আমলই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আর যাকাতও গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। তাই যাকাতও আদায় করার সময় খাঁটি নিয়্যাত করা জরুরী। কারণ **শিরকযুক্ত ইবাদত** আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অপরদিকে যত ইখলাসের সঙ্গেই ইবাদত করা হোক না কেন যদি 'ইত্তিবায়ে সুন্নাত' বা রাসূল (সা:) এর তরিকা অনুসরণ করা না হয় তাহলে সেটি হবে 'বিদআত'। ইবাদতের নামে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন-সুন্নাহর দলীল প্রমাণ ছাড়া নবআবিস্কৃত কোন **বিদ'আতযুক্ত ইবাদত** আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন: ঈদের দিনে সাওম রাখা, হায়েজ-নেফাস অবস্থায় সাওম রাখা এমনিভাবে যোহর, আছর ও এশার সালাতের মত মাগরীবের সালাতেও ফরজ চার রাকাআ'ত আদায় করা এগুলো যত এখলাসের সাথে সওয়াবের উদ্দেশ্যেই হোক না কেন তা আল্লাহ কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তেমনিভাবে আমাদের সমাজে প্রচলিত মিলাদ-মাহফিল, মানুষ মারা যাওয়ার পরে তিনদিনা খতম, চল্লিশা, মৃত্যুবার্ষিকী, দূরুদে নারীয়া, দূরুদে হাজারী, খতমে খাজেগান, মৃত্যু ব্যক্তির ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে খতমে কুরআন-দোয়া, অজিফা ইত্যাদি পাঠ করা।

সুদখোর, ঘুষখোর, মদখোর ও জুয়াচোরদের দ্বারা তিনশ তের বদরী সাহাবীদের নামে কমিটি গঠন করে বাৎসরিক চাঁদা আদায় করা, বোখারী শরীফের খতম পড়া, ফরজ সালাতের পরে নিয়মিতভাবে দু'হাত তুলে সম্মিলিত মুনাজাত করা, মাজার তৈরী করা, মাজারে ফুল দেয়া, আগরবাতি, মোমবাতি দেওয়া, বিভিন্ন পীরদের নামে তরীকা তৈরী করা,

[৭৫] সহীহ মুসলিম ৫০৩৬; সহীহ বুখারী ১ নং হাদীস।

সেই তরীকার জন্য স্বতন্ত্র জিকির ও অজিফা তৈরী করা ইত্যাদি কাজগুলো যত এখলাসের সঙ্গেই করা হোক না কেন যেহেতু এগুলো কুরআনে নাই, হাদীসে নাই, রাসূলুল্লাহ সা: করেন নাই, কোন সাহাবী করেন নাই, তাবেয়ীন করেন নাই, কোন মুজতাহিদ ইমাম করেন নাই, কোন মুহাদ্দিসীন করেন নাই তাই এগুলো নিঃসন্দেহে বিদআ'ত।

খ) যাকাত আদায় করে খোঁটা না দেওয়া

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}

অর্থ: "হে মুমিনগণ, **তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদাকা বাতিল করো না**। সে ব্যক্তির মত, যে তার সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বাস করে না আলাহ ও শেষ দিনের প্রতি। অতএব তার উপমা এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর রয়েছে মাটি। অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ল, ফলে তাকে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলল। তারা যা অর্জন করেছে তার মাধ্যমে তারা কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। আর আলাহ কাফির জাতিকে হিদায়াত দেন না।"[৭৬]

{وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

অর্থ: " আর তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এমন কসম না করে যে, তারা নিকটাত্মীয়দের, মিসকীনদের ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের কিছুই দেবে না। আর তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষক্রটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেন? আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৭৭]

{وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا } [الإنسان: ٨، ٩]

অর্থ: "তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। তারা বলে,'আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির

[৭৬] সুরা বাকারা ২৬৪।
[৭৭] সুরা নূর ২৪:২২।

উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান চাই না এবং কোন শোকরও না।"[৭৮]

গ) পবিত্র এবং উত্তম জিনিষের মাধ্যমে যাকাত আদায় করা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব: ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَنْفقُوا منْ طَيِّبَات مَا كَسَبْتُمْ وَممَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ منَ الْأَرْض وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبيثَ منْهُ تُنْفقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخذيه إِلَّا أَنْ تُغْمضُوا فيه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنيٌّ حَميدٌ} [البقرة: ٢٦٧]

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া যা তোমরা গ্রহণ করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।[৭৯]

এই আয়াতে উত্তম এবং পবিত্র মাল দ্বারা যাকাত আদায় করতে বলা হয়েছে। কুরআনুল কারীমের অন্য আয়াতে আরও একধাপ এগিয়ে প্রিয় মালকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفقُوا ممَّا تُحبُّونَ وَمَا تُنْفقُوا منْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ به عَليمٌ}

অর্থ: "তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালবাস। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে, তবে নিশ্চয় আলাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।"[৮০]

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবু তালহা (রা:) তার সবচেয়ে প্রিয় বাগানটি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عن أَنَسَ بْنَ مَالك رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَار بالْمَدينَة مَالًا وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَاله إِلَيْه بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبلَةَ الْمَسْجد وَكَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ منْ مَاء فيهَا طَيِّب فَلَمَّا نَزَلَتْ {لَنْ تَنَالُوا الْبرَّ حَتَّى تُنْفقُوا ممَّا تُحبُّونَ} قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ في كتَابه {لَنْ تَنَالُوا الْبرَّ حَتَّى تُنْفقُوا ممَّا تُحبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للَّه أَرْجُو برَّهَا وَذُخْرَهَا عنْدَ اللَّه فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّه حَيْثُ شئْتَ فَقَالَ بَخٍ ذَلكَ مَالٌ رَائحٌ ذَلكَ مَالٌ رَائحٌ قَدْ سَمعْتُ مَا

[৭৮] সুরা ইনসান ৭৬:৮-৯।
[৭৯] সুরা বাকারা ২৬৭।
[৮০] সুরা আল ইমরান ৯২।

قُلْتَ فيهَا وَأَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا في الْأَقْرَبينَ قَالَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّه فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في أَقَارِبه وَبَني عَمِّه

অর্থ: "আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু তালহা (রা:) ছিলেন মদীনায় আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। তার নিকট সবচেয়ে প্রিয় জিনিষ ছিল 'বাইরুহা' নামক একটি বাগান। বাগানটি মসজিদের সামনেই ছিল। রাসূলুল্লাহ সা: মাঝে মাঝে সেখানে যেতেন এবং তার উত্তম পানি পান করতেন। যখন এই আয়াত নাজিল হলো, "তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালবাস।" তখন আবূ তালহা (রা:) রাসূলুল্লাহ সা: এর নিকটে গেল এবং বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ সুব: তার কিতাবে বলেছেন, "তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালবাস।" আমার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো এই 'বাইরুহা' নামক বাগানটি। আমি এখন এটা আল্লাহর রাস্তায় সাদাকাহ করে দিলাম। আমি আল্লাহর কাছে এর উত্তম বিনিময় চাই। আপনি এটা যেখানে ইচ্ছা খরচ করুন। রাসূলুল্লাহ সা: বললেন, ওহ! এটাতো খুব সুন্দর মাল! এটা তো খুবই সুন্দর মাল। এর ব্যাপারে তুমি যা বলেছ আমি শুনেছি। আমি চাই এটা তুমি তোমার আত্মিয়স্বজনের মাঝে বন্টন করে দাও। আবূ তালহা (রা:) বললেন, আমি এমনটাই করবো আল্লাহর রাসূল! এরপর সে আবু তালহা (রা:) বাগানটি তার আত্মিয়স্বজন এবং তার চাচাতো ভাইয়ের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।[৮১]

আমাদেরও এই হাদীস অনুযায়ী প্রিয় মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা উচিত। অনেককে দেখা যায় যে, তারা তাদের ছিড়া-ফাড়া নোটটি দান করার জন্য রেখে দেয় এটা কোনভাবেই কাম্য নয়।

ঘ) গোপনে দান করা

{إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَات فَنعمَّا هيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ منْ سَيِّئَاتكُمْ وَاللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ} [البقرة: ٢٧١]

অর্থ: "তোমরা যদি সাদাকা প্রকাশে কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপন কর এবং ফকীরদেরকে তা দাও, তাহলে তাও তোমাদের জন্য

[৮১] সহীহ বুখারী ২৩১৮; সহীহ মুসলিম ২৩৬২

উত্তম এবং তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মুছে দেবেন। আর তোমরা যে আমল কর, আলাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।"[৮২]

ঙ)নির্বোধ ও অজ্ঞলোকদের বেশী না দেয়া

{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: ٥]

অর্থ: "আর তোমরা নির্বোধদের হাতে তোমাদের ধন-সম্পদ দিও না, যাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য করেছেন জীবিকার মাধ্যম এবং তোমরা তা থেকে তাদেরকে আহার দাও, তাদেরকে পরিধান করাও এবং তাদের সাথে উত্তম কথা বল।"[৮৩]

যাকাতুল ফিতর

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতর বা সাদাকাতুল ফিতর কাকে বলে?

উত্তর: রমযান মাস শেষ হওয়ার পর ঈদুল ফিতরের দিন অর্থাৎ শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে প্রত্যেক মুসলমান স্বেচ্ছাকৃতভাবে গরীবদের মধ্যে যে খাদ্য বন্টন করে থাকে, ফিকাহবিদ ও মুহাদ্দিসগণ তাকে 'যাকাতুল ফিতর' নামে নামকরণ করেছেন। একে 'সাদকাতু ফিতর' ও বলা হয়।

হাদীস এবং অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে সাওম (রোজা) ফরয করা হয় এবং একই বছর রাসূলুল্লাহ (সা:) যাকাতুল ফিতরের আদেশ জারি করেছিলেন। তিনি ফিতরার পরিমাণও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা:) সাদাকায়ে ফিতর হিসাবে এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব প্রতিটি স্বাধীন এবং পরাধীন (গোলাম) মুসলমানের উপর ফরয করে দিয়েছেন। হাদীস:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা:) (রমজান মাসে) প্রত্যেক মুসলিম স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ, মহিলা, ছোট, বড় সকলের

[৮২] সুরা বাকারা ২৭১।
[৮৩] সুরা নিসা ৪:৫।

উপর এক 'সা' খেজুর বা এক 'সা' যব সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব করেছেন।"[৮৪]

খেজুর এবং যব ছাড়া অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যও সাদাকাতুল ফিতর হিসাবে দেয়া যায়। । হাদীস:

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা ফেতরার যাকাত এক 'সা' খাদ্য অথবা এক 'সা' ভুট্টা অথবা এক 'সা' খেজুর অথবা এক 'সা' পনির অথবা এক 'সা' কিসমিস দ্বারা আদায় করতাম।[৮৫]

ঈমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবনে হাম্বল, আবুল আলীয়া, আতা, ইবনে সিরীন ও আল-বুখারীসহ অনেকের মতে 'যাকাতুল ফিতর' ফরয ইবাদত। আর ঈমাম আবু হানিফা ও তাঁর অনুসারীদের মতে তা ওয়াজিব।

যাকাতুল ফিতরের প্রয়োজনিয়তা

যাকাতুল ফিতরের কারণ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা:) সাদাকাতুল ফিতরকে ফরজ করেছেন সায়েমকে (সিয়াম অবস্থার) অনর্থক কথা এবং অন্যায় কাজের গুনাহ থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকিনদের খাবারের ব্যাবস্থা করার জন্য।[৮৬]

সাওমপালনকালীন সময় মানুষ খাদ্যগ্রহণ ও যৌনঅঙ্গের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকে। কিন্তু মানুষ তার মানবীয় দুর্বলতার কারণে মুখ, কান, চক্ষু কিংবা হাত-পা দ্বারা শরিয়ত নিষিদ্ধ কথা বা কাজ দ্বারা কলুষিত হতে পারে, তাই রমযান মাসে সাওমপালনকারী ব্যক্তির বাজে কথাবার্তা ও বাজে কাজ

[৮৪] সহীহ বুখারি ১০৫৩; সহীহ মুসলিম ২৩২৬;।
[৮৫] সহীহ বুখারি ১৫০৬; সহীহ মুসলিম ২৩৩০।
[৮৬] সুনানে আবু দাউদ ১৬১১।

থেকে তার আত্মার পবিত্রকরণের জন্যই রামাজান মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে ফিতরা ধার্য করা হয়েছে।

একই সাথে যাকাতুল ফিতরের মাধ্যমে সমাজের গরীব-মিসকিনদের জন্য ঈদের দিনে খাদ্যের ব্যবস্থা করা, যেন অভাবের লাঞ্ছনা নিয়ে তাদেরকে ঈদের দিনে ভিক্ষা করতে না হয়। ঈদের আনন্দ ধনী-গরীব সকলের মাঝে বিস্তার লাভ করা এবং সমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পারস্পরিক ভালাবাসা, সমপ্রীতি ও সহানুভূতির গুণাবলী বৃদ্ধির লক্ষ্যে যাকাতুল ফিতর একটি অপরিহার্য ব্যবস্থা। ফিতরা ধার্য করার লক্ষ্য একদিকে পবিত্রকরণ করা, অন্যদিকে গরীব-মিসকিনদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা ও তাদের স্বচ্ছল করার একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি।

রাসূল (সা:) ফিতরের যাকাত বাবদ এক সা' খাদ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এক সা'তে যে পরিমাণ খাদ্য হয়, তা একজন গরীবের ঘরের সদস্যদের জন্য যথেষ্ট এবং ঈদের দিনে পরিতৃপ্তির সাথে খেতে সক্ষম। অন্যদিকে ফিতরদাতাদের পক্ষেও এ পরিমাণ খাদ্য দান করা কষ্টকর হয় না।

যাকাতুল ফিতর ব্যক্তির উপর ধার্য হয়, আর অন্যান্য যাকাত বা সাদাকাহ ধার্য হয় সম্পদের উপর।

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ কি?

উত্তর: যাকাতুল ফিতরের পরিমাণের ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে।

১) 'এক সা' : অধিকাংশ আলিমদের মতে যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ 'এক সা'। আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত হাদীস:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা:) (রমজান মাসে) প্রত্যেক মুসলিম স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ, মহিলা, ছোট, বড় সকলের উপর এক 'সা' খেজুর বা এক 'সা' যব সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব করেছেন।"[৮৭] "আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস:

[৮৭] সহীহ বুখারি ১০৫৩; সহীহ মুসলিম ২৩২৬;।

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা ফেতরার যাকাত এক 'সা' খাদ্য অথবা এক 'সা' ভুট্টা অথবা এক 'সা' খেজুর অথবা এক 'সা' পনির অথবা এক 'সা' কিসমিস দ্বারা আদায় করতাম।[৮৮]

২) অর্ধ 'সা' গম : ঈমাম আবু হানীফা রহ. মতে অর্ধ 'সা' পরিমাণ গম দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় করা জায়িজ। ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীস:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

অর্থ: "ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা:) প্রত্যেক পুরুষ, মহিলা, আযাদ ও গোলামের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিতর-ই-রামাজান হিসাবে এক 'সা' খেজুর বা এক এক 'সা' যব আদায় করা ফরজ করেছেন। তারপর লোকেরা অর্ধ 'সা' গমকে এক 'সা' খেজুরের সমমান দিতে লাগল। (রাবি নাফি' বলেন) ইবনে ওমর (রা:) খেজুর (সাদাকাতুল ফিতর হিসাবে) দিতেন। এক সময় মদীনায় খেজুর দুর্লভ হলে যব দিয়ে তা আদায় করেন। ইবনে ওমর (রা:) প্রাপ্ত বয়স্কও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সকলের পক্ষ থেকেই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন, এমনকি আমার সন্তানদের পক্ষ থেকেও সাদাকার দ্রব্য গ্রহীতাদেরকে দিয়ে দিতেন এবং ঈদের এক-দু'দিন পূর্বেই আদায় করে দিতেন।"[৮৯]

উল্লেখ্য যে, হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আটা বা গমের পরিবর্তে তার মূল্য আদায় করাও জায়েয হবে।

[৮৮] সহীহ বুখারি ১৫০৬; সহীহ মুসলিম ২৩৩০।

[৮৯] সহীহ বুখারি ১৪২৩।

প্রশ্ন: 'সা' এর পরিমান কি?

উত্তরঃ 'সা' হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সময়ে মদীনায় প্রচলিত খাদ্যশস্য পরিমাপের নির্দিষ্ট পাত্র বা ভান্ডের মাপ। 'সা' এর মাপ আয়তনিক, ওজনের মাপ নহে। সেইযুগে বিশ্বের সব অঞ্চলেই পাত্রের বা কৌটার মাপে খাদ্যশস্য লেনদেন ও ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন ছিল। এমনকি বর্তমান যুগেও পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে পাত্র বা কৌটার মাপে খাদ্যশস্য লেনদেন ও ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন আছে। আর পাত্রের আকারও একেক অঞ্চলে একেক ধরণের। তাছাড়া তরলজাতীয় জিনিষের পরিমাপ পৃথিবীর সর্বত্রই পাত্রের (আয়তনিক) মাপে করা হয়ে থাকে। তৎকালীন মদীনাবাসীরা ছিল কৃষিজীবী, তাদের কাছে পাত্রের মাপে লেন-দেনের ব্যবহার অধিক ছিল। আর মক্কাবাসীরা ছিল ব্যবসায়ী, দাঁড়িপাল্লায় ওজনের মাপে তারা অধিক নির্ভরশীল ছিল। তৎকালীন মদীনায় (হিজায অঞ্চলে) প্রচলিত আকারের এক 'সা' সমপরিমাণ বর্তমান কালের মেট্রিক পদ্ধতির ওজন নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে আলেমদের মাঝে সামান্য মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। কেউ কেউ 'দুই কিলো পাঁচশত বিশ গ্রাম' (২.৫২০) চাল অথবা দুই কিলো একশত ছিয়াত্তর গ্রাম (২.১৭৬) গম সাব্যস্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ দুইকিলো চল্লিশ গ্রাম বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। মনে রাখতে হবে যে, খাদ্য বা শস্যদানার ঘনত্ব ও হালকা বা ভারী ধরনের হওয়ার কারণে একই পাত্রের মাপে বিভিন্ন খাদ্য ও শস্যদানার ওজনে এর কিছুটা কম-বেশী হতে পারে। **একারণে সর্তকতার জন্য যে অঞ্চলের লোকদের প্রধান খাদ্য যেটা ঐ অঞ্চলের লোকেরা ঐ অঞ্চলের প্রধান খাদ্য পূর্ণ আড়াই কিলো হিসাবে আদায় করবে। তাহলে সব রকম মতবাদের উর্দ্ধে উঠে নিশ্চিতভাবে 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায় হয়ে যাবে।**

তৎকালীন আরব অঞ্চলগুলিতে আরেকটি পদ্ধতিতে 'সা' এর পরিমাপ হিসাব করার প্রচলন জানা যায়, তা হল 'মুদ'। মুদের পাত্র আকারে ছোট, ৪ (চার) মুদ এর পরিমাণ এক 'সা'র সমান। মুদ পরিমাপ করার আরেকটি পদ্ধতির প্রচলন ছিল, তা হচ্ছে মধ্যম আকারের একজন বক্তির দুই হাতের ভরা কোষ পরিমাণ খাদ্যশস্য এক মুদ বলে গণ্য করা হত। যাদের কাছে পরিমাপের পাত্র অথবা ওজন করার দাড়িপাল্লা ছিল না, তারা এরূপ চার কোষ (মুদ) এর পরিমাণ এক 'সা'র সমান হিসাব করতেন।

আরব অঞ্চলের ওজনের মাপে মদীনার এক 'সা' সমান পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ রতল। এক রতল সমান বর্তমান কালের মেট্রিক পদ্ধতির ওজনে ৪০৮ গ্রাম। সে হিসাবে পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ (৫-১/৩) রতল সমান ২১৭৬ গ্রাম গম।

রাসুলুল্লাহ((সা:)) সাদাকাতুল ফিতরের খাদ্য এক সা' পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যা একটি পাত্রের মাপ। এই মাপটি স্থায়ী, এর কোন পরিবর্তণ নাই। সর্বকালে, বিশ্বের সকল অঞ্চলে এই মাপটি সমান।

'সা' এর ওজনের পরিমাপে হিজাযী ও ইরাকী ফিকাহবিদদের মতপার্থক্য

রাসূলুল্লাহ ((সা:)) কর্তৃক মদীনায় প্রচলিত একটিমাত্র পরিমাপ ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন এবং সেটিকেই অনুসরণ করতে বলেছেন। বিশ্বের সকল মুসলমান মদীনায় প্রচলিত সা' এর পরিমাপ অনুসরণ করে যাকাতুল ফিতর প্রদান করবেন, এটা নবীজীর নির্দেশ, এতে সকলে সম্পূর্ণ একমত থাকবেন।

ইরাকের অধিবাসী ইমাম আবু হানিফা (র:) ও তাঁর সমর্থকরা এক 'সা'কে ওজনের মাপে আট (৮) বাগদাদী রতল সমান হিসাব করেন। অথাৎ ইরাকীদের হিসাবে এক 'সা' ওজনে মদীনায় প্রচলিত 'সা' এর চেয়ে ওজনে প্রায় দেড়গুণ। ইরাকী ফিকাহবিদরা বলেন, আমাদের পরিমাপটি ওমর (রা:) ব্যবহৃত 'সা' এর মত, তা ৮ (আট) রতল। তাঁরা আরও বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) আট রতল পানি দিয়ে গোসল করতেন ও দুই রতল পানি দিয়ে ওজু করতেন অথবা রাসূলুল্লাহ (সা:) এক 'সা' পানি দিয়ে গোসল করতেন ও এক মুদ পানি দিয়ে ওজু করতেন। তাদের মতে এক 'সা' সমান আট রতল এবং এক মুদ সমান দুই রতল।

ঈমাম মালেক, শাফেঈ, আহমদ ও অন্যান্য হিজাযবাসীরা মদীনার এক 'সা' সমান পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ রতল হিসাব করেন। হিজাযীদের দলিল হল মদীনায় প্রচলিত 'সা' পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ রতল এবং তা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সময় থেকেই বংশানুক্রমে চালু হয়ে এসেছে। আর সুন্নাহ অনুযায়ী মাদানী সা' এর পাত্রের পরিমাপ অনুসরণ করতে হবে। ইবনে হাজম বলেন, এ সা'র বিষয়টি মদীনার ছোট-বড় সকলেরই জানা। এ

ব্যাপারে সঠিক কথা জানার জন্য বাগদাদের আব্বাসীয় আমলে প্রধান বিচারপতি ঈমাম আবূ ইউসুফ মদীনায় গিয়েছিলেন এবং তিনি সেখানকার আনসার ও মুহাজিরদের প্রায় ৫০ জন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের সা' পাত্রগুলি দেখেন। মদীনাবাসী ব্যক্তিবর্গ তাঁকে বলেন, এরূপ সা' রাসূলুল্লাহ (সা:) সময় থেকেই বংশানুক্রমে প্রচলিত হয়ে এসেছে। আবূ ইউসুফ সেগুলো ওজনে পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ রতল বলে মনে করেন। ফকীহ মুজতাহিদ ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন 'আমি সা' এর ব্যাপারে আবু হানিফার কথা ত্যাগ করলাম ও মদীনাবাসীদের কথা গ্রহণ করলাম'। ইমাম মালিক ইবনে আনাসও বলেছেন, একই ধরণের সা' রাসূল (সা:) ব্যবহার করেছেন। ইমাম মালিক নিজেই খলীফা হারুন আল-রশীদের সম্মুখে এক সা' শস্যদানা ওজন করে দেখিয়েছেন। হিজরী তৃতীয় শতকে ঈমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন 'আমি এক সা গম ওজন করেছি, তা পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ রতল পরিমাণের হয়'। আল-রয়ীস বলেন, 'সত্যি কথা এই যে, অকাট্য দলীল-প্রমাণ পাওয়ার পর এ পরিমাণটির ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকাই উচিত নয়'। আল-রয়ীস আরও বলেন, ঈমাম মালিকের চাইতে মদীনার সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আর কে বেশী জানেন? ঈমাম আবূ ইউসুফের সাক্ষ্যর চাইতে বড় সাক্ষ্য আর কার হতে পারে?

মদীনার সমাজে প্রচলিত সা', বাস্তব পরীক্ষণের মাধ্যমে এর ওজনের পরিমাপ নির্ণয় এবং মুজতাহিদ ফকীহদের সাক্ষ্য ও মতানুযায়ী এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে হিজাযী ফিকাহবিদদের মতটিই সহীহ, মদীনায় প্রচলিত এক সা' সমান পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ (৫-১/৩) রতল। যা বর্তমান কালের মেট্রিক পদ্ধতির ওজনে ২.৪০ (দুই কিলো চল্লিশ গ্রাম) কিলোগ্রাম গমের সমান।

নিস্‌ফে সা' গম এর প্রচলন

'নিস্‌ফ' আরবী শব্দ, এর অর্থ অর্ধেক। দুই মুদ বা অর্ধ সা' পরিমাণকে 'নিসফে সা' বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা:) ফিতরার পরিমাণ এক সা' খাদ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। সাধারণ খাদ্য হিসাবে গমের ব্যবহার তখন কম ছিল। সাহাবাদের (রা) শাসন আমলে গমের আমদানী ও ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।

গমের মূল্য বেশী ছিল বিধায় দুই মুদ বা অর্ধ সা' পরিমাণ গম ফিতরা বাবদ প্রদান করার প্রচলন হয়। "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার((রা:)) হতে বর্ণিত,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

অর্থ: "ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা:) প্রত্যেক পুরুষ, মহিলা, আযাদ ও গোলামের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিতর-ই-রামাজান হিসাবে এক 'সা' খেজুর বা এক এক 'সা' যব আদায় করা ফরজ করেছেন। তারপর লোকেরা অর্ধ 'সা' গমকে এক 'সা' খেজুরের সমমান দিতে লাগল। (রাবি নাফি' বলেন) ইবনে ওমর (রা:) খেজুর (সাদাকাতুল ফিতর হিসাবে) দিতেন। এক সময় মদীনায় খেজুর দুর্লভ হলে যব দিয়ে তা আদায় করেন। ইবনে ওমর (রা:) প্রাপ্ত বয়স্কও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সকলের পক্ষ থেকেই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন, এমনকি আমার সন্তানদের পক্ষ থেকেও সাদাকার দ্রব্য গ্রহীতাদেরকে দিয়ে দিতেন এবং ঈদের এক-দু'দিন পূর্বেই আদায় করে দিতেন।"[৯০]

নিম্নের হাদিসটির বর্ণনা খুবই স্পষ্ট। হাদীস:

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّى أُرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

---

[৯০] সহীহ বুখারি ১৪২৩।

فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَــدًا مَا عِشْتُ

অর্থ: “আবু সায়ীদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) যখন আমাদের মধ্যে ছিলেন, তখন আমরা ছোট ও বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাস প্রত্যেকের পক্ষ হতে সাদাকাতুল ফিতর বাবদ এক সা’ পরিমাণ খাদ্য অথবা এক সা’ পনীর অথবা এক সা’ যব অথবা এক সা’ খেজুর অথবা এক সা’ কিশমিশ প্রদান করতাম। এভাবেই আমরা তা প্রদান করতে থাকি। পরে মুয়াবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান (রা:) হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে যখন আমাদের নিকট আসলেন, তখন তিনি মিম্বরে আরোহণ করে উপস্থিত লোকদের সাথে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বললেন, আমার মতে সিরিয়ার দু’ মুদ গম মদীনার এক সা’ খেজুরের সাথে বিণিময় হয়। লোকেরা তা গ্রহন করে নিলেন। আবু সায়ীদ খুদরী (রা:) বলেন আমি তো যতদিন জীবিত থাকব ঐ ভাবেই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করব, যে ভাবে আমি পূর্বে (এক সা’) আদায় করে এসেছি।” [৯১]

এই হাদিসে সিরিয়ার শাসনকর্তা খলিফা মুয়াবিয়ার (রা:) বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়-

১) রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সময়ে যে সকল খাদ্য (যব, খেজুর, পনীর ও কিশমিশ ইত্যাদি) দিয়ে ফিতর প্রদান করা হত সেগুলোর মধ্যে গমের উল্লেখ স্পষ্টভাবে ছিল না এবং তিনি কখনও দুই মুদ বা অর্ধ সা’ গম দিতে বলেননি, তাই তার উল্লেখ এখানে নাই। যদি কখনও রাসূলুল্লাহ (সা:) দুই মুদ বা অর্ধ সা’ গম দিতে বলে থাকতেন তবে নিশ্চয়ই এখানে তা উল্লেখ করতেন। কারণ উক্ত মজলিসে খলিফা মুয়াবিয়ার (রা:) সাথে তাঁর সমর্থক অনেক সাহাবী (রা:) ও উপস্থিত ছিলেন যারা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সংস্পর্শ পেয়েছিলেন। উক্ত মজলিসে অনেক লোক উপস্থিত থাকা সত্বেও যদি কোন সাহাবী অথবা কোন তাবীঈ’ন জানতেন যে মুয়াবিয়ার (রা:) সিদ্ধান- রাসুলুল্লাহ (সা:) এর সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ তাহলে তিনি তা উল্লেখ করতেন। যাহোক ইজতিহাদের ভিত্তি ছিল এক সা’ খেজুরের তৎকালীন

[৯১] সহীহ মুসলিম ২৩৩১।

বিণিময় মূল্যের সমপরিমাণ গম (অর্ধ সা’) ফিতর বাবদ নির্ধারণ করা। ইজতিহাদ ও রায় শরীয়তসম্মত, কিনা এর পক্ষে অকাট্য দলিল না থাকলে তা অগ্রহণীয়।

২) মদীনার এক সা’ খেজুরের সহিত সিরিয়ার উন্নত মানের দুই মুদ গম বিণিময় হত, তাই সেই সময়কার বাজার দর অনুযায়ী খেজুরের বিণিময় মূল্যের সমতার শর্তে রাসুলুল্লাহ ((সা:)) নির্দেশিত এক সা’র পরিবর্তে দুই মুদ বা অর্ধ সা’ পরিমাণ গম সাদাকাতুল ফিতর বাবদ সিরিয়া অঞ্চলের জন্য নির্ধারণ করেন। এক সা’ খেজুরের বিকল্প হিসাবে দুই মুদ বা অর্ধ সা’ পরিমাণ গমের এই সিদ্ধান- নেয়ার পিছনে এক সা’ খেজুরের বিণিময় মূল্যের সমপরিমাণ গম প্রদান করা যথেষ্ট বলে বিবেচনা করেছিলেন, কারণ সেই সময়ে গমের মূল্য খেজুরের মূল্যের চেয়ে বেশী ছিল। জনসাধারণ এক সা’ গম দিলে বেশী মূল্যের কারণে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে তাই খেজুর ও গমের বাজার দর যাচাই করে নিসফে সা’ গম প্রদানের এই সিদ্ধান- নেন।

৩) আঞ্চলিক খাদ্যের প্রতি স্পষ্টতই গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কারণ সিরিয়া অঞ্চলের সাধারণ খাদ্য গম, জনসাধারণ যেন তাদের নিজেদের খাদ্য থেকে সাদাকাতুল ফিতর প্রদান করতে পারে, এই প্রয়োজনে তাদের ফিতরের খাদ্য হিসাবে গম নির্বাচন করেছেন। উপরোক্ত হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) ফিতরা বাবদ গম নির্বাচনের বিরোধিতা করেননি, তিনি বিরোধিতা করেছেন গমের পরিমাণের, দুই মুদ বা অর্ধ সা’ পরিমাণের বিরোধিতা করেছেন।

এক সা’ খেজুরের সাথে দুই মুদ গমের বিণিময়ের ঘটনা রাসুলুল্লাহ ((সা:)) এর পরে সংঘটিত হয়। ইবনে উমর (রা:) এই বর্ণনা থেকেও তা প্রমাণ করে- “আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন, রাসুলুল্লাহ((সা:)) সাদাকাতুল ফিতর হিসাবে এক সা’ খেজুর অথবা এক সা’ যব আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। পরবর্তীকালে লোকেরা দু’মুদ গমকে তার সমপরিমাণ হিসাবে ধরে নিয়েছে”। [৯২]

আবু সায়ীদ খুদরী (রা) আরও বলেছিলেন ‘এটা মুয়াবিয়ার মূল্য নির্ধারণ- আমি গ্রহণও করি না, তদানুযায়ী আমলও করি না’(ফতহুল বারী, আল-মুস্ত

[৯২] সহীহ বুখারি ১৪২৩।

াদরাক)। আবু সায়ীদ খুদরী (রা) ছাড়াও অনেক সাহাবায়ে কিরাম (রা:) মূল্যের হিসাবের বিরোধিতা করেছেন। হযরত আলীর (রা:) কথা থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীস:

فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ – رضى الله عنه – رَأَى رُخْصَ السِّعْرِ قَالَ قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَـيْكُمْ فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعًا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ

অর্থ: "হযরত আলী (রা:) যখন (বসরাতে সব জিনিষের সস্তা মূল্য দেখতে পান, তিনি তখন তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে স্বচ্ছলতা দিয়েছেন, তোমরা গম ও অন্যান্য খাদ্যের এক সা' পরিমাণই দাও"[৯৩]

আলী (রা:) সহ অনেক সাহাবীগণ (রা:) গমের ক্ষেত্রেও এক সা' প্রদানের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতেন। হাসান বসরী, জাবির বিন জায়দ, মালিক, শাফেঈ, আহমদ বিন হান্বল এবং ইসহাকের মতে সাদাকাতুল ফিতর এক সা' দিতে হবে, সেটা গম বা অন্য যাই কিছু হউক না কেন।

রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সময়ে যে সকল খাদ্য (যব, খেজুর, পনীর ও কিশমিশ ইত্যাদি) দিয়ে ফিতর প্রদান করা হত, বর্তমানকালে সেগুলোর মধ্যে মূল্যের পার্থক্য আছে। খেজুর, পনীর ও কিশমিশের মূল্য গম ও যবের চেয়ে অনেকগুণ বেশী। আমাদের দেশেও বিভিন্ন খাদ্যের মধ্যে মূল্যের পার্থক্য বিদ্যমান আছে, যেমন উন্নতমানের চালের মূল্য গমের মূল্যের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশী। খাদ্যাভাসের কারণে কোন ব্যক্তি বা কোন সমাজে বা অঞ্চলে বা কোন দেশে যেসকল লোক সারা বছর বেশীদামের খাদ্য খেতে অভ্যস্ত ও আর্থিকভাবে সক্ষম, তারা সেই খাদ্য দিয়ে ফিতরা দিতে স্বাভাবিকভাবেই সক্ষম হবেন।

মূল্যের ব্যাপারটি পরিবর্তণশীল, মূল্য স্থায়ী থাকে না। হয়তবা সাময়িকভাবে কোন সময়ে বা কোন যুগে এর পরিবর্তণ নাও থাকতে পারে, কিন্ত বাস্তবে স্থায়ী হয় না। কোন দ্রব্যের বাজার মূল্য নির্ধারিত হয় প্রধানত: ঐ দ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও চাহিদার কারণে। এই কারণগুলির যে কোন একটির কম বা বেশী হলে অন্যটিকে প্রভাবিত করে, যার ফলে বাজার মূল্যও কমে বা বাড়ে। তাছাড়া সকল স্থানে, অঞ্চলে বা দেশে একই দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন মূল্য হয়ে থাকে, অর্থাৎ কমবেশী হয়ে থাকে। তাই

[৯৩] সুনানে আবূ দাউদ ১৬২৪।

খেজুরের মূল্যের পার্থক্য শর্তে নির্ধারিত নিসফে সা' গম প্রদানের বিধান ঐ সময়কার জন্য ঠিক ছিল মনে করা হলেও পরবর্তীকালে গমের মূল্য কমে যাওয়ার কারণে তা অকার্যকর হয়ে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ ঢাকার বাজারে সাধারণ মানের এক কেজি খেজুরের মূল্য ১০০ টাকা, এ হিসাবে এক সা' (২.৫০০ কেজি) খেজুরের মূল ২৫০ টাকা। আর যদি এক কেজি গমের মূল্য ২৫ টাকা হয়, তাহলে এক সা' খেজুরের মূল্যের বিণিময়ে ১০ কেজি গম পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে খেজুরের মূল্য গমের মূল্যের চেয়ে চারগুন বেশী। মদীনার খেজুরের মূল্যের সাথে যদি গমের তুলনা করা হয়, তাহলে প্রথমে বলতে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নতমানের খেজুর উৎপন্ন হয় মদীনা অঞ্চলে। মদীনার এক কেজি 'আজওয়া' খেজুরের বর্তমানকালের মূল্য কমপক্ষে ১০০০ টাকা, সে হিসাবে এক সা' (২.৫০০ কেজি) খেজুরের মূল্য ২৫০০ টাকা, যার বিণিময়ে ১০০ কেজি (এক কুইন্টাল) গম পাওয়া যাবে। বর্তমানকালে মদীনার খেজুরের মূল্য গমের মূল্যের চেয়ে চল্লিশগুণ বেশী, অথচ মুয়াবিয়া (রা:) এর সময়ে গমের মূল্য মদীনার খেজুরের মূল্যের চেয়ে বেশী ছিল। অতএব, বর্তমানকালে নিসফে সা' গমের মূল্য এক সা' খেজুরের মূল্যের বিকল্প নয়। কিশমিশ ও পনীরের মূল্য গমের চেয়ে অনেক বেশী। যবের ব্যবহার আমাদের দেশে নাই। এসব কারণে মুহাক্কিক আলেমগণ মনে করেন নিসফে সা' গম প্রদানের প্রয়োজনীয়তা, যৌক্তিকতা ও কার্যকারিতা নাই। গমের ক্ষেত্রেও ফিতরার পরিমাণ হবে এক সা'।

প্রশ্ন: কোন কোন খাদ্যের বিনিময়ে যাকাতুল ফিতর আদায় করা যাবে?

উত্তর:

عن أَبَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা ফেতরার যাকাত এক 'সা' খাদ্য অথবা এক 'সা' ভুট্টা অথবা এক 'সা' খেজুর অথবা এক 'সা' পনির অথবা এক 'সা' কিসমিস দ্বারা আদায় করতাম।[৯৪]

[৯৪] সহীহ বুখারি ১৫০৬; সহীহ মুসলিম ২৩৩০।

হাদিসে উল্লেখিত 'খাদ্য' বলতে অনেক আলেমের ধারণা আবু সায়ীদ খুদরী প্রথমে এক সা' খাদ্যের উল্লেখ করেছেন পরবর্তিতে খাদ্যগুলির বর্ণনা দিয়েছেন, অনেকের মতে কেবলমাত্র গমকে বুঝানো হয়েছে, আবার অনেক আলেম মনে করেন দেশের বা সমাজের প্রধান খাদ্য বুঝানো হয়েছে যেমন গম, ভুট্টা, চাল, ময়দা, বাজরা, জোয়ার বা অন্য যে কোন খাদ্য যা ঐ অঞ্চলের বা দেশের প্রচলিত প্রধান খাদ্য। মতামত যাই হউক না কেন, 'খাদ্য' বলতে যেটিই বুঝনো হউক, তা সমাজের সাধারণ খাদ্যের অনর্ভূক্ত বলে বিবেচিত। হাদিস গ্রন্থসমূহে যেসকল খাদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় যেমনঃ যব, খেজুর, পনীর ও কিশমিশ সেগুলি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সময়ে তৎকালীন মদীনার সমাজে প্রচলিত খাদ্য। সাহাবাদের (রাঃ) শাসন আমলে গমের আমদানী ও ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।

বর্তমানে ইসলাম সারা বিশ্বের সকল অঞ্চলে ছড়িয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশের ও অঞ্চলের মানুষের খাদ্য ভিন্ন ভিন্ন। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের মানুষের মোট গড় খাদ্যের অর্ধেকের বেশী খাদ্যের উৎস দানাদার শস্য যেমন চাল, ভূট্টা, যব, গম, ওট, বাজরা, জোয়ার ইত্যাদি। আর বাকি অন্যান্য খাদ্য যেমন মূল ও কন্দ জাতীয় যেমন ইয়াম, কাসাবা, আলু, মিষ্টিআলু, মূখী ইত্যাদি, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, তৈল, চর্বি, চিনি, বাদাম, শাঁস, ডাল ও শুঁটি, ফল-মূল, লতা-পাতা ও শাকসব্জি ইত্যাদি।

আলেমগণ সব ধরণের খাদ্য দিয়ে ফিতরা প্রদান যায়েজ মনে করেন না। শুকনো খাবার যেগুলো সংরক্ষণ করা সহজ, ফিতরার জন্য সেগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। পঁচণশীল এবং যে সকল খাদ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়, এগুলো দিয়ে ফিতরা প্রদান সমর্থন করেন না।

দানাদার খাদ্য যেমন চাল, যব, গম, ভূট্টা, বাজরা, জোয়ার ইত্যাদির প্রচলন পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে আছে এবং এগলোর যে কোন একটি বা একাধিক দানাদার খাদ্য কোন অঞ্চল বা দেশের সাধারণ খাদ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যাকাতুল ফিতর এর পরিমাণ হলো এক 'সা' খাদ্য। খেজুর, কিশমিশ, বিভিন্ন দানাদার শস্য যেমন চাল, যব, গম, ভূট্টা, ময়দা, বাজরা, জোয়ার, পনির, গুড়া দুধ বা মাংস ইত্যাদি দিয়ে যাকাতুল ফিতর প্রদান করা যাবে।

ফিকাহবিদগণ মনে করেন দেশের সাধারণ খাদ্য দিয়ে যাকাতুল ফিতর প্রদান করা উচিত। অভ্যাসগত কিংবা শারীরিক সমস্যা বা হজমশক্তি কারণে কোন ব্যক্তি যদি ভিন্ন খাদ্য গ্রহণ করে তবে ঐ ব্যক্তির নিজের খাদ্য অথবা দেশের সাধারণ খাদ্য, এর যে কোন একটি দিয়ে যাকাতুল ফিতর প্রদান করা উচিত। **আরেকটি মত হচ্ছে, যিনি যে মানের খাদ্যদ্রব্য বছরের বেশিরভাগ সময় আহার করেন, সে মানের খাদ্যদ্রব্যের ভিত্তিতেই যাকাতুল ফিতর প্রদান করা উচিত।**

তবে শর্ত হলোঃ দানাদার খাদ্য হতে হবে। বাতিল, ঘুণে ধরা ও নষ্ট খাদ্য দেয়া যাবে না। ফিকাহবিদগণ আরও মনে করেন দেশের সাধারণ খাদ্য অথবা কোন ব্যক্তির নিজের খাদ্য চিহ্নিত করা গেলে, কেউ যদি কার্পণ্য ও অর্থলিপ্সার কারণে তার চেয়ে নিম্নমানের খাদ্যে যাকাতুল ফিতর প্রদান করে, তাহলে তা জায়েয হবে না। তবে কেউ উচ্চমাণের খাদ্য প্রদান করলে তা জায়েয হবে।

উল্লেখ্য, দানাদার খাদ্যগুলোর মধ্যে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের প্রধান খাদ্য চাল। চাল একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য, এবং মূল্যের দিক থেকেও অন্যান্য দানাদার খাদ্যের চেয়ে বেশী। চাল দিয়ে যাকাত, ফিতরা, ফিদিয়া, কাফফারা, মান্নত, দান-খয়রাত ইত্যাদি প্রদান করা সম্পূর্ণরূপে জায়েয। আরব, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমীরাত, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া সহ বিশ্বের অনেক দেশে চাল দিয়ে ফিতরা প্রদান করা হয়। আরবে সুন্নাহ অনুযায়ী কেবলমাত্র খাদ্য দিয়ে ফিতরা প্রদান করা হয়, নগদ অর্থ প্রদানে উৎসাহিত করা হয় না। ফিতরা প্রদানকারী ক্রেতাদের সুবিধার জন্য এক সা' পরিমাণ নির্ধারিত ওজনের প্যাকেটকৃত চাল রমযানের শেষের দিকে আরবের সর্বত্র সকল দোকানপাট এমনকি ফুটপাতেও বিক্রি হয়ে থাকে। পবিত্র কা'বা ও মসজিদে নববীর চারপাশেও প্যাকেটকৃত চাল বিক্রির একই দৃশ্য দেখা যায়। একই সময়ে সমগ্র আরবে 'যাকাত আদায় ও বিতরণকারী' সংস্থাগুলোর অস্থায়ী স্টলসমূহে ফিতরা প্রদানকারীদের কাছ থেকে চালের প্যাকেট সংগ্রহ করা হয় এবং যথাসময়ে ফিতরাগ্রহীতাদের নিকট হস্থান্তর করা হয়।

আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য চাল দিয়েই ফিতরা প্রদান করা উচিত। আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি এবং

মেহমানদারী, ফকির-মিসকিন খাওয়ানো, দান-খয়রাত ইত্যাদি কাজে চালই ব্যবহার হয়ে থাকে। আমরা ভাত খেয়ে জীবন ধারণ করি এবং সালাত-সাওম সহ সকল ইবাদতসমূহ পালন করে থাকি। ফিকাহবিদগণ মনে করেন সমাজের সাধারণ খাদ্য থেকে তাদের ফিতরা প্রদান করা উচিত কারণ সমাজের ধনী-গরীব সকল লোক একই খাদ্যে অভ্যস্ত, তাহলে যাকাতদাতার জন্য নিজের খাদ্য দিয়ে ফিতরা প্রদান করা সহজ হবে এবং ফিতরাগ্রহীতাও তার চাহিদামত খাদ্যটি পাবে। গরীব-মিসকিন মানুষের দ্বারে দ্বারে চাল ভিক্ষা চায় আর ক্ষুধার্ত হলে দু'মুঠো ভাত চায়। ঘরে ঘরে মুষ্টিচাল ভিক্ষা দেয়া আর ফকির-মিসকিনদেরকে ভাত খাওয়ানো আমাদের সমাজের অতি প্রাচীন ঐতিহ্য। যেহেতু যাকাতুল ফিতর প্রদান করার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য গরীব-মিসকিনদের জন্য ঈদের দিনে খাদ্যের ব্যবস্থা করা, যেন অভাবের লাঞ্ছনা নিয়ে তাদেরকে ঈদের দিনে ভিক্ষা করতে না হয়, সেহেতু কেবলমাত্র চাল দিয়েই তাদের এই চাহিদা পূরণ করে ভিক্ষা করা থেকে নিবৃত্ত করা সম্ভব।

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতর কাদের উপর ওয়াজিব?

উত্তরঃ ঈদুল ফিতরের দিন সূর্যোদয়ের পূর্বে যার নিকট যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে তার উপর যাকাতুল ফিতর (ফিতরা) ওয়াজিব। পূর্ণ বৎসর নিসাব পরিমাণ মালের মালিক থাকার দরকার নাই। যাকাতের ক্ষেত্রে ঘরের আসবাবপত্র হিসাব হয় না। কিন্তু ফিতরার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় আসবাবপত্র ব্যতিত অন্যান্য দ্রব্যাদি, অতিরিক্ত ঘর (খালি বা ভাড়ায় ব্যবহৃত) ইত্যাদি সম্পদ ধর্তব্য হবে।

অধিকাংশ আলিমের মতে, কোন ব্যক্তির নিকট ঈদের দিনে তার পরিবারের একদিন একরাত ভরণ-পোষণের খরচ ছাড়া অতিরিক্ত যাকাতুল ফিতর আদায় করা পরিমাণ অর্থাৎ এক সা' পরিমাণ খাদ্য থাকলেই যাকাতুল ফিতর প্রদান করতে হবে। যদি কারো নিকট এ পরিমাণ খাদ্য বা টাকা না থাকে তবে তাকে যাকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে না। বিভিন্ন হাদীসের ভাষা থেকে বুঝা যায় যে, কারো নিকট একদিন ও একরাতের খাবার থাকলে তার জন্য ভিক্ষা করা বা হাত পাতা ঠিক নয়। হাদীসঃ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ

রাসূলুল্লাহ ((সাঃ)) বলেছেন, "যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষা করে সে জাহান্নামের দিকে বেশি অগ্রসর হল। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুখাপেক্ষীর মাপকাঠি কি? তিনি বললেন, একদিন একরাতের খাবার থাকা।"[৯৫]

নর-নারী, যুবা-বৃদ্ধ নির্বিশেষে প্রতিটি মুসলমানের উপর যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব। ইবনে ওমরের (রাঃ) বর্ণনা দ্বারা এটা নিশ্চিত করা হয়েছে। হাদীসঃ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَــاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

অর্থঃ "আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) (রমজান মাসে) প্রত্যেক মুসলিম স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ, মহিলা, ছোট, বড় সকলের উপর এক 'সা' খেজুর বা এক 'সা' যব সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব করেছেন।"[৯৬]

নিজের পক্ষে, স্ত্রী এবং তার উপর নির্ভরশীল সকলের পক্ষে, এমনকি তার উপর নির্ভরশীল পিতামাতার পক্ষে যাকাতুল ফিতর প্রদান করতে হবে। তবে কেউ নিজে ইচ্ছা না করলে এবং তাদের অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি তার ভৃত্যদের পক্ষে যাকাতুল ফিতর প্রদান করতে বাধ্য নন।

প্রশ্নঃ যাকাতুল ফিতর কখন আদায় করতে হবে?

উত্তরঃ সাওমপালনকারী ব্যক্তির চিত্তের পরিশোধনের অন্যতম উপায় হিসাবে তার উপর যাকাতুল ফিতর ধার্য করা হয়। এজন্য শেষ রমযানের দিন সূর্যাস্তের পরই যাকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে। যেহেতু শেষ রমযানের দিনের সূর্যাস্তের সাথে সাথেই সাওমের অবসান ঘটে, সেহেতু যাকাতুল ফিতরও তখন আদায় করতে হয়। সুন্নাহ অনুযায়ী ঈদের নামাযের পূর্বেই যাকাতুল ফিতর প্রদান করা উচিত। এর ফলে গরীব-

---

[৯৫] সুনানে আবু দাউদ ১৬৩১।

[৯৬] সহীহ বুখারি ১০৫৩; সহীহ মুসলিম ২৩২৬;।

মিসকীনরা আনন্দচিত্তে অন্যান্য মুসলমান ভাইদের সাথে ঈদগাহে যেতে সক্ষম হয়।

হাদীসের ভিত্তিতে যাকাতুল ফিতর প্রদানের দু'টি সময় পাওয়া যায়।

(১) ফযিলতপূর্ণ সময়। (২) ওয়াক্তে জাওয়ায বা সাধারণ সময়।

প্রথমত ফযিলতপূর্ণ সময়: ঈদের দিন সকালে ঈদের সালাতের পূর্বে আদায় করা। সহীহ বুখারিতে আবদুল্লাহ ইবনে আব্ব্স (রা:) থেকে বর্ণিত:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْــرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা:) সাদাকাতুল ফিতরকে ফরজ করেছেন সায়েমকে (সিয়াম অবস্থার) অনর্থক কথা এবং অন্যায় কাজের গুনাহ থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকিনদের খাবারের ব্যাবস্থা করার জন্য। যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পূর্বে আদায় করলো তারটা গ্রহণযোগ্য হবে আর যে ব্যক্তি সালাতের পরে আদায় করবে তারটা অন্যান্য সাদাকার মত সাধারণ সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে।[৯৭]

সুতরাং বিনা কারণে সালাতের পর বিলম্ব করলে তা 'সাদাকাতুল ফিতর' হিসাবে গ্রহনযোগ্য হবে না। কারণ তা রাসূল (সা:) এর নির্দেশের পরিপন্থী। এজন্য ঈদুল ফিতরের সালাত একটু বিলম্ব করে আদায় করা উচিত যাতে মানুষ সালাতের পূর্বেই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে পারে। অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে রাসূল (সা:) এর যুগে সাহাবায়ে কেরামগণ ঈদের দিন সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন। হাদীস:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفطر صاعا من طعام

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল (সা:) এর যুগে **ঈদের দিন** এক 'সা' পরিমাণ খাদ্য (সাদাকায়ে ফিতর) হিসাবে আদায় করতাম।"[৯৮]

---

[৯৭] সুনানে আবু দাউদ ১৬১১।

[৯৮] সহীহ বুখারি১৪৩৯।

দ্বিতীয়ত যায়েজ সময়: ঈদের এক দুইদিন পূর্বে সাদাকাতুর ফিতর আদায় করা যায়েজ। বুখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নাফে' (র:) বলেন:

فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني . وكان ابـــن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين

অর্থ: "ইবনে ওমর (রা:) নিজের এবং ছোট-বড় সন্তানদের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন, রাবী নাফে বলেন, এমনকি তিনি আমার সন্তানদের পক্ষ হতেও। তিনি যাকাতের হকদারদেরকে ঈদের একদিন বা দু'দিন পূর্বে সাদাকাতুল ফিতর পৌছে দিতেন।"[৯৯]

মোট কথা: পূর্বের হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট ভাবে বুঝা গেল যে, সাদাকাতুল ফিতর ঈদের সালাতের পূর্বেই আদায় করতে হবে। বিনা করণে ঈদের সালাতের পর আদায় করা জায়েয নেই। তবে যদি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ বিলম্ব করে, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। যেমন সে এমন স্থানে আছে যে, তার নিকট আদায় করার মত কোন বস্তু নেই বা এমন কোন ব্যক্তিও নেই, যে এর হকদার হবে। অথবা হঠাৎ তার নিকট ঈদের সালাতের সংবাদ পৌঁছল, যে কারণে সালাতের পূর্বে আদায় করার সুযোগ পেল না। অথবা সে কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়েছিল, আর সে আদায় করতে ভূলে গেছে। এমতাবস্থায় সালাতের পর আদায় করলে কোন অসুবিধা নেই। কারণ সে অপারগ।

ওয়াজিব হচ্ছে: সাদাকাতুল ফিতর তার প্রাপকের হাতে সরাসরি বা উকিলের মাধ্যমে যথাসময়ে সালাতের পূর্বে পৌঁছানো। যদি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে প্রদানের নিয়ত করে, অথচ তার সঙ্গে বা তার নিকট পৌঁছাতে পারে এমন কারো সঙ্গে সাক্ষাত না হয়, তাহলে অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করবে। বিলম্ব করবে না।

---

[৯৯] সহীহ বুখারি ১৪২৩।

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতর কাদেরকে প্রদান করতে হবে?

উত্তর: ফিতরা কেবলমাত্র মুসলিম ফকীর মিসকীনদেরকে প্রদান করতে হবে। হাদীসে রয়েছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْـرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা:) সাদাকাতুল ফিতরকে ফরজ করেছেন সায়েমকে (সিয়াম অবস্থার) অনর্থক কথা এবং অন্যায় কাজের গুনাহ থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকিনদের খাবারের ব্যাবস্থা করার জন্য।[১০০]

রাসূলুল্লাহ (সা:) এর বাণীটি এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, যাকাতুল ফিতর মিসকীন, ফকীর ও অভাবীদের হক। আল্লামা শাওকানী রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, "এতে দলীল রয়েছে যে, ফিতরা কেবল যাকাতের খাতসমূহের মধ্য থেকে মিসকীনদের মাঝে প্রদান করা হবে"।[১০১]
যদি কোন মুসলমান ঈদের জামায়াতের আগে যাকাতুল ফিতর প্রদান করতে ভুলে যায় তাহলে ঈদের সালাতের পরে যাকাতুল ফিতর প্রদানের অনুমোদন নাই। কেননা যাকাতুল ফিতর প্রদানের প্রধান উদ্দেশ্য হল ঈদের দিনে গরিবদের প্রয়োজন মিটানো। কাজেই যাকাতুল ফিতর প্রদানে বিলম্ব ঘটলে এর উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত হাদিসে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়, "সাওমপালনকারী ব্যক্তি সাওম রাখা কালে যে সব বাজে কথায় লিপ্ত হয়েছেন তাহা থেকে তাহার আত্মার শুদ্ধির জন্য আল্লাহর রাসুল (সা:) যাকাতুল ফিতর প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন ।"জুমহুর আলিমের মতে, কোন প্রকার ওযর ছাড়া ঈদের সালাতের আগে আদায় না করে দেরী করলে তাতে পাপ বা গুনাহ হবে। তবে তা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকেই যাবে। বিলম্ব হলেও প্রদান করতে হবে।

---

[১০০] সুনানে আবু দাউদ ১৬১১।
[১০১] যাকাতুল ফিতর, নাদা আবু আহমাদ, পৃষ্ঠা :১৪

প্রশ্ন: এক এলাকার যাকাতুল ফিতর অন্য এলাকায় স্থানান্তর করা যাবে কি?

উত্তর: যাকাতুল ফিতর প্রদানকারীর নিজ দেশেই এটা বিতরণ করা উচিত। মহানবী (সা:) এর হাদিসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, " এটা (যাকাতুল ফিতর) ধনিদের মধ্য থেকে নিতে হবে এবং গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হবে"। অনেক দেশে এবং অনেক অঞ্চলে মুসলিম জনগোষ্ঠির মধ্যে যাকাতপ্রার্থীর সংখ্যা খুবই কম। আবার অনেক দেশে এবং অনেক অঞ্চলে মুসলিমদের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠির সংখ্যা খুবই বেশী। ক্ষুধা ও বুভূক্ষাজনিত দুর্দশাগ্রস্ত এ সব মুসলমান যাকাত পাওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। যেসকল দেশ ও অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে যাকাতপ্রার্থীর সংখ্যা খুবই কম, তাদের উচিত তাদের উদ্বৃত্তের কথা বিবেচনা করে তাদের যাকাতুল ফিতর এসব দরিদ্র মুসলমানদের জন্য পাঠিয়ে দেয়া। অনেক জ্ঞানী আলেম মনে করেন প্রয়োজনের অগ্রাধিকার অথবা উদ্বৃত্তের কথা বিবেচনা করে যাকাতুল ফিতর প্রদানকারী ব্যক্তির দেশ থেকে অন্য কোন দেশে স্থানান্তর করা যেতে পারে।
বর্তমানকালে অনেক লোক তাদের কর্মস্থানের কারণে বিদেশে অবস্থান করেন। অনেকেই তাদের নিজ দেশের গরীব আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদেরকে তাদের ফিতরা প্রদানে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে যদি তিনি সুন্নাহ অনুযায়ী খাদ্য প্রদান করতে চান তবে তিনি নিজ দেশে তার নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা এক সা' খাদ্য ক্রয় করে যাকাতপ্রার্থীকে প্রদান করতে পারেন। আর ফিতরা যদি নগদ অর্থে প্রদান করতে চান, তবে তিনি বর্তমানে যে দেশে অবস্থান করেন সে দেশের স্থানীয় বাজারে এক সা' খাদ্যের মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ নিজ দেশের যাকাতপ্রার্থীর নিকট পাঠাতে পারেন। তবে নিজ দেশের খাদ্যের মূল্য প্রদান করতে পারবেন না, তিনি বর্তমানে যে দেশে অবস্থান করেন সে দেশের খাদ্যের মূল্য দিতে হবে।
যাকাতুল ফিতর এক দেশ থেকে অন্য কোন দেশে স্থানান্তরের ক্ষেত্রেও অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঈদের জামায়াতে যাওয়ার আগেই যাকাতুল ফিতর প্রাপকদের কাছে পৌছাতে হবে।

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতর নগদ অর্থে প্রদান করা যাবে কি?

উত্তরঃ খাদ্যদ্রব্য ছাড়া উহার মূল্যবাবদ নগদ অর্থ প্রদান করার ব্যাপারে মত পার্থক্য আছে।

ঈমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ র. মূল্য প্রদান সমর্থন করেন নি। ঈমাম আহমদ বলেন- আমি ভয় করছি যে তাতে আদায় হবে না। তাছাড়া তা রাসূল (সা:) এর সুন্নাতের পরিপন্থি।

ঈমাম সওরী, আবু হানীফা ও তাঁর সঙ্গীগণ মূল্য প্রদান করা জায়েয বলেছেন।

জ্ঞানী আলেমদের অনেকে মনে করেন যে, খাদ্য-দ্রব্যের গুণগত মানকে বিবেচনায় এনে (বর্তমান বাজার মূল্যে) নগদে যাকাতুল ফিতর প্রদান করা যায়। মানুষের জন্য যাকাত প্রদানের কাজটিকে সহজ করে তোলাই এর লক্ষ্য।

তবে এটা মনে রাখতে হবে যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের মানদন্ডে যাকাতুল ফিতর হিসাব বৈধ নয়। কারণ এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক বছর থেকে অন্য বছরে খাদ্য সামগ্রীর দামের ব্যাপক তারতম্য ঘটে।

প্রশ্ন: নগদ অর্থে যাকাতুল ফিতর হিসাব করা হবে কিভাবে?

উত্তরঃ যাকাতুল ফিতর প্রদানের সময়, ফিতরা প্রদানকারী ব্যক্তি স্থানীয় বাজারে এক সা' খাদ্যের মূল্যের সমপরিমাণ নগদ অর্থ হিসাব করবেন।

উদাহরণ স্বরূপঃ সাধারণ মানের চাল প্রতি কেজি ৩০ টাকা হলে, এক সা' বা ২.৫০০ কেজি চালের মূল্যবাবদ জনপ্রতি ফিতরা ৭৫ টাকা হবে।

মাঝারী মানের চাল প্রতি কেজি ৪০ টাকা হলে, এক সা' বা ২.৫০০ কেজি চালের মূল্যবাবদ জনপ্রতি ফিতরা ১০০ টাকা হবে।

উৎকৃষ্ট মানের চাল প্রতি কেজি ৬০ টাকা হলে, এক সা' বা ২.৫০০ কেজি চালের মূল্যবাবদ জনপ্রতি ফিতরা ১৫০ টাকা হবে।

উপরের এই হিসাবগুলি কেবলমাত্র উদাহরণ, ফিতরা প্রদানকারীব্যক্তি ফিতরা প্রদানের দিন তিনি যে মানের চাল বছরের বেশীরভাগ সময় গ্রহন করেন, স্থানীয় বাজারে সে মানের চালের মূল্য যাচাই করে এক সা' বা ২.৫০০ কেজি চালের মূল্য জনপ্রতি ফিতরা নগদ অর্থে নির্ধারণ করবেন।

অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঈদের জামায়াতে যাওয়ার আগেই যাকাতুল ফিতর প্রাপকদের কাছে পৌঁছাতে হবে।

উপসংহার

যাকাত সংক্রান্ত এই কিতাব থেকে আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলাম মদীনা শরিফ পর্যায়ে যে যাকাত ফরজ করেছে এবং তার সীমা, পরিমান ও বিধি-বিধান বর্ণনা করেছে তা বিশ্ব মানবতার ইতিহাসে এক অভিনব ও অনন্য ব্যবস্থা। কোন আসমানী বিধানেই ইতিপূর্বে অনুরূপ কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি। কোন মানব রচিত মতবাদ বা জীবন বিধানেও তার কোন দৃষ্টান্ত খুজে পাওয়া যাবে না। যাকাত একটি অর্থনৈতিক বিধান যেমন, তেমনি সামাজিক, সামষ্টিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক ও দ্বীনি ব্যবস্থা- একসাথে এ সবই।

যাকাত একটি আর্থিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা:

কেননা তা একটি সুনির্দিষ্ট আর্থিক কর বিশেষ। কখনো তা মাথাপিছু ধার্য করা হয় যেমনঃ ফিতরার যাকাত। কখনো ধন-মালের উপর আরোপিত হয় যেমনঃ মওজুদ মাল ও আমদানির উপর। সাধারণ যাকাত ব্যবস্থার এটা নিয়ম। ইসলামে বায়তুল মালের আয়েল উৎস হিসাবে তা একটা চিরন্তন অর্থনৈতিক উৎস। ব্যক্তিদেরকে অভাব-দারিদ্র থেকে মুক্তকরণ এবং তাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পরিপুরনের জন্যে ব্যয়িত হয়। উপরোন্ত তা পূজিকরণ এবং ধন-মালের স্বাভাবিক আবর্তণ ও উৎপাদনে বিনিয়োগ বন্ধ করণের বিরূদ্ধে এক কার্যকর আঘাত বিশেষ।

যাকাত একটা সামাজিক ব্যবস্থাও:

কেননা তা সমাজের লোকদেরকে তাদের প্রকৃত ও সম্ভাব্য অক্ষমতার বিরূদ্ধে নিরাপত্তা দানের কাজ করে। আকস্মিক বিপদ ও দুর্দশার ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা খুবই কার্যকর। তা লোকদের মধ্যে একটা মানবিক নিরাপত্তা গড়ে তোলে। যেখানে 'আছে'র দলের লোকেরা 'নেই' দলের লোকদের সাহায্য করে। শক্তিশালী দূর্বলের হাত ধরে উপরে তোলে। মিসকিন, নি:স্ব পথিক নিরাপত্তা লাভ করে। ধনি ও গরীবের মধ্যকার পার্থক্য ও দুরত্ব হ্রাস করে। সক্ষম ও অক্ষমদের মধ্যকার পারস্পারিক হিংসা ও বিদ্বেষ এবং পরশ্রীকাতরতার অগ্নী নির্বাপিত করে। লোকদের মধ্যে যারা পারস্পারিক বিবাদ মিমাংসার কাজ করে এবং তা করতে গিয়ে অনেক আর্থিক ঝুকিতে পরে যায় যাকাত ব্যবস্থা তাদের সাহায্য করে এবং তারা সাধারণ কল্যানের পথে যে ঋণ মাথায় চাপিয়ে নেয়, তা শোধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

অনুরূপভাবে বহু প্রকারের সামাজিক সমস্যার সমাধান করে দেয়, তার অতি উচ্চ কল্যাণকর লক্ষ্য বাস্তবায়নে, তার সম্মুখবর্তী পবিত্র উদ্দেশ্যাবলী পরিপূর্ণ কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করে।

যাকাত একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা:

কেননা যাকাতের ব্যাপারে মূলকথা হচ্ছে, রাষ্ট্রই তা সংগ্রহ ও তার খাত সমূহে বন্টনের জন্যে দায়িত্বশীল। তাতে তাকে সুবিচার ও ন্যায় পরায়নতার নীতি কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করতে হয়। প্রয়োজন সমূহের পরিমান নির্ধারণ ও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকে অগ্রাধিকার দান তার দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। আর তা করতে হবে একটা নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত ও শক্তিশালী ব্যবস্থার মাধ্যমে, যা হবে কুরআনের ভাষায় সংরক্ষক, অভিজ্ঞ ও অবহিত। এ ধরণের কর্মচারীও তাতে নিযুক্ত করে নিতে হবে। সরকারের নিজস্ব দায়িত্বে কয়েকটি ক্ষেত্রে যাকাত ব্যয়ের ব্যবস্থা করতে হবে যেমন, 'আল মুআল্লাফাতু কুলূবুহুম' এবং 'ফী সাবীলিল্লাহ'।

যাকাত একটা নৈতিক ব্যবস্থা:

কেননা তার লক্ষ্য হচ্ছে ধনি লোকদের মন-মানসকে ধবংসকারী লোভ-কার্পণ্য এবং কলুষিত আত্মম্ভরিতার ময়লা আবর্জনা থেকে পবিত্র করা এবং বদান্যতা, দানশীলতা, কল্যান ও প্রেমে তাদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধতায় ভরপুর করে দেওয়া। অন্যলোকদের দু:খ-দুর্দশায় সহানুভূতি ও দয়া-মায়া সহকারে তাদের সাথে একাত্ম করে তোলা। বঞ্চিতদের অন্তরে যে হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে তা নির্বাপনে বিরাট কাজ করে। এবং অন্য লোকদেরকে আল্লাহ (সুব) যে জীবনের মহামূল্য সামগ্রী ও সুখ-সম্পদ ভরে দিয়েছেন তা দেখে তাদের চোখ টাটায়- যাকাত তা শিথিল করে দেয়। লোকদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করে।

সর্বপোরি তা একটা দ্বীনি ব্যবস্থা:

কেননা যাকাত প্রদান করা ঈমানের দিক দিয়ে সাহায্যকারী কর্ম সমূহের অন্যতম। ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন। অতীব কার্যকর একটা ইবাদত। যা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য খুবই শানিত। কেননা অভাবগ্রস্ত লোককে তা দেয়ার প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে: দ্বীনের প্রতি তার ঈমানকে সুদৃঢ় ও স্থায়ী করা, আল্লাহর অনুগত্য ও ইবাদত করনে, তাঁর নির্দেশাবলী কার্যকরনে তার সাহায্য ও সহযোগীতা করা। কেননা যে দ্বীন এ মহান

ব্যবস্থা উপস্থাপন করেছে, সে দ্বীনই তৎসংক্রান্ত যাবতীয় আইন-বিধান, পরিমান ও তার ব্যয়ের ক্ষেত্র সমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট ও প্রতিভাত করে দিয়েছে। তার একটা অংশ অভাবগ্রস্থ লোকদের অভাব-দারিদ্র মোচনে ব্যবহার করার জন্যে নির্দিষ্ট করেছে। তার অপর একটা নির্দিষ্ট করেছে লোকদের হৃদয় সন্তুষ্ট ও আকৃষ্ট করার ও তার সাহায্য করার কাজে ব্যয় করার জন্য। তার দ্বীনের কালিমা সর্বত্র প্রচার করা এবং পৃথিবীর বুকে দ্বীনের দাওয়াত ও বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিয়োগ করার জন্য। যেন কোথাও আল্লাহর আনুগত্য ও অধিনতা ব্যবস্থাহীন না থাকে। এবং সমগ্র পৃথিবীর বুকে একমাত্র আল্লাহর দ্বীন পরামাত্রায় কার্যকর ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বস্তুত এ-ই হচ্ছে যাকাত। ইসলামই যাকাতকে জারী ও কার্যকর করেছে শরিয়ত সম্মতভাবে– যদিও আজকের এ শেষ যুগের মুসলিম জাতি তার এ নিগুঢ় তত্ত্ব ও তাৎপর্যের কথা বেমালুম ভুলে গেছে। তা রীতিমত আদায় করা ছেড়ে দিয়েছে। অবশ্য কিছু লোক এখনো এর ব্যতিক্রম আছে তবে তুলনামূলকভাবে তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

এ যাকাত ব্যবস্থা-ই এককভাবে প্রমান করেছে যে, এ দ্বীন ও এ শরিয়ত বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহর কাছ থেকেই অবতীর্ন। উম্মি মুহাম্মদ (সা:) এর কোন সাধ্যই ছিল না নিজস্বভাবে এই একক ও অনন্য সুবিচার মূলক জীবন বিধান দুনিয়ায় পেশ করা ও বিশ্ব মানবকে তা গ্রহণের জন্য পথ দেখানো। এ দ্বীন তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তার ফসল নয়। তাঁর জ্ঞান-তথ্য সমৃদ্ধ বা নি:সৃত নয়– যদি না আল্লাহ তাঁকে বিশেষভাবে অহীযোগে এ ক্ষমতা ও সুযোগ দিতেন, তাহলে এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে। তিনি যা জানতেন না আল্লাহই তাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন।

যাকাতের পক্ষে অমুসলিমদের বক্তব্য:

যাকাতের এ তুলনাহীন ব্যবস্থার মাহাত্ম্য এবং মহত্ব বহু নামধারি মুসলিম–ই হয়তো বুঝে উঠতে পারছে না বরং যাকাতকে বিকৃত করেছে এবং ইসলামে বিশ্বাসী বলে দাবী করা সত্তেও যাকাতকে তারা নানাভাবে গালমন্দ করেছে। তারা কিন্তু ইসলামী নাম যথারীতি বহন করে চলেছে। অথচ পাশ্চাত্য লেখকদের মধ্যেও এমন লোক প্রচুর রয়েছে যারা যাকাত ব্যবস্থার উচ্চ প্রসংসা করেছে। শুধু তা–ই নয়, মানুষের কল্যানের জন্যে এরূপ একটা মহান ব্যবস্থা কার্যকর করনে সারা দুনিয়ার আধুনিক জীবন

ব্যবস্থার সর্বাগ্রে ইসলাম–ই যে ব্যবস্থা করেছে সেকথাও তার অকপটে স্বীকার করেছেন। অরনোল্ড তার 'ইসলামী দাওয়াত' নামক গ্রন্থে ইসলামের প্রধান নিদর্শনাবলীর সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে ইসলামী হজ্জ এবং তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তার মহান লক্ষ্য সম্পন্ন হওয়া সম্পর্কে বলিষ্ঠ কণ্ঠে উল্লেখ করেছেন। পরে যাকাত সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "হজ্জ ব্যবস্থার পাশাপাশি আমরা আরেকটা ফরজ কাজ হিসাবে পাচ্ছি যাকাত প্রদান ব্যবস্থা। মুসলিম জাতি আল্লাহর এ কথাটি স্মরণ করে 'মুমিনরা সব ভাই ভাই।' এটি একটা দ্বীনি দৃষ্টিভঙ্গি অতি উজ্জল রূপে এটা বাস্তবায়িত হয় এই ব্যবস্থার মাধ্যমে। তা খুব বিস্ময়কর ভাবে হালকা বৃষ্টি বর্ষণ করে ইসলামী সমাজের মধ্যে। নও-মুসলিমদের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা প্রদর্শনের উজ্জলতর ভূমিকা পালন করে– তার জাতীয়তা, তার বর্ণ, তার পূর্ববংশ যাই হোক না কেন সে-ই মুমিন সমাজে সাদরে গৃহীত হয় এবং অন্যান্য মুসলিমদের সাথে সমান মর্যাদায় সে উপযুক্ত স্থান লাভ করে।"[১০২]

লিউড্রোশ বলেনঃ "যে দুটো কঠিন সামাজিক ব্যবস্থা গোটা বিশ্বকে জর্জরিত করে তুলেছে, তার সমাধান আমি ইসলামে পেয়েছি। প্রথম– 'আল্লাহর ঘোষণা সব মুমিন ভাই ভাই।' সামাজিকভাবে মৌল বিধানে সংক্ষিপ্ত ঘোষণা এটা। আর দ্বিতীয়– 'প্রত্যেক মালদারের উপরেই যাকাত ফরজ করা।' এমনি গরীবদেরকে তাদের প্রাপ্য জোরপূর্বক নিয়ে নেওয়ার সুযোগ দান– যদি তা দিতে ইচ্ছুক না হয় বা দিতে অস্বীকার করে। এটাই প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠার পন্থা।

অন্য একজন অমুসলিম কতৃক লিখিত গ্রন্থে যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ "এ 'কর'টি একটি দ্বীনি ফরজ কাজ। সকলের পক্ষেই তা দেয়া বাধ্যতামূলক। তা দ্বীনি ফরজ হওয়া ছাড়াও যাকাত একটা সামষ্টিক বিধান–সর্বসাধারণ ও নির্বিশেষ। এমন একটা উৎস, মুহাম্মদী বিধান অনুসারী রাষ্ট্রের মাধ্যমে একটা সম্পদ সংগ্রহ করে এবং তার মাধ্যমে গরীব-মিসকীনদের সাহায্য করে তাদের স্বচ্ছল বানায়। আর এটা করা হয়

[১০২] আদ দাওয়াত ইলাল ইসলাম, তমাস আরলোল্ড পৃষ্ঠা, ৪৫৭- অনুবাদঃ ড. ইবরাহীম হাসান ও তার সহযোগী গন, পৃষ্ঠাঃ ১৭৬।

একটা সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে, স্বৈরতান্ত্রিক বল প্রয়োগের মাধ্যমে নয়– নয় কোন অস্থায়ী উড়ন্ত পন্থার মাধ্যমে।"[১০৩]

এ অভিনব ব্যবস্থা প্রবর্তনে ইসলামই প্রথম অবদান রেখেছে। মানব ইতিহাসে সাধারণভাবেই তার ভিত্তি ইসলাম কর্তৃকই সর্বপ্রথম সংস্থাপিত হয়েছে। অতএব যাকাত মালিক, ব্যবসায়ী ও ধনিশ্রেণীর লোকদের তা দিতে বাধ্য করা হতো যেন সরকার বা রাষ্ট্র গরীব-অক্ষম লোকদের জন্য ব্যয় করতে পারে। এ ব্যবস্থা সেই প্রাচীরকে ধূলিস্মাৎ ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে, যা একই রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিরাট পার্থক্যের সৃষ্টি করতো। আর এর দ্বারা সামাজিক সুবিচারের পরিমন্ডলের গোটা উম্মতকে ঐক্য বদ্ধ করেছে। একারণে ইসলামী ব্যবস্থা প্রমান করেছে যে, তা কোন বিদ্বেষ বা হিংসার প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে গঠিত হয় নি। প্রখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যবিদ মাসিনিউন এর উক্তিঃ "দ্বীনে ইসলামের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা তাই যা সাম্যের চিন্তাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে খুব বেশী কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। আর তা করা হয় যাকাত ফরজ করার সাহায্যে। যা প্রত্যেক ব্যক্তিই বায়তুল মালে জমা করে। যা সূদী ব্যবস্থা ও অপ্রত্যাক্ষ্য করসমূহ যা জরুরী ও প্রাথমিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে ধার্য করা হয়– কে উৎপটিত করে সাময়িকভাবে ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যবসায়ী মূলধনকে ঠেকিয়ে দেয়। আর এর সাহায্যে ইসলাম দ্বিতীয় বার পুঁজিবাদী বুর্জোয়া ব্যবস্থা ও বলশেভিক কমিউনিষ্ট ব্যবস্থার মাঝখানে একটা সম্মানজনক স্থান দখল করে নেয়।"[১০৪]

ইতালী লেখিকা ড. ফাগলিরী তার গ্রন্থে যা লিখেছেন তা আরবী ভাষায় অনুদিত হয়েছে 'দিফা' আনিল ইসলাম' নামে। তাতে বলা হয়েছে, "আমি মোটামুটি সব ধর্মে আরোপিত নৈতিক মহান সামাজিক গুরুত্ব– যা সাদাকা দান দেওয়ার ব্যবস্থা পেশ করেছে– স্বীকার করি এবং আমি তার ভাল দিককে দয়া-অনুগ্রহের বাস্তব ব্যাখ্যা বলে গণ্য করি। কিন্তু ইসলাম সাদাকাকে বাধ্যতামূলক করণে একক আদর্শ মর্যাদা ভোগ করেছে। মসীহর শিক্ষাকে। দুনিয়ার ব্যাপারস্বরূপ এবং এখান থেকেই তা বাস্তবায়িত করার

[১০৩] আল ইসলামু ওয়াল হাদারাতুল গারবিয়্যাহ, কুরদে আলী অনুদিত, লাজনাতুত তালীফ থেকে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৭৬।

[১০৪] আদ দিফা' আনীল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৬৯।

দরুন। তাই প্রত্যেকটি মুসলিম তার সম্পদের একটা অংশ ফকির পথিক মিসকীনের কল্যাণের জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দিতে বাধ্য। আর এ দ্বীনি ফরয পালন করানোর মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তির মানবিকতার গভীর অনুভূতির যাচাই করা হয়। তার অন্তর ও আত্মা লোভ-কার্পণ্য থেকে পবিত্র হয় এবং মহান আল্লাহর কাছ থেকে শুভ কর্মফল লাভে আশা-আকাঙ্খার সফলতা পায়।"[১০৫]

যাকাত সম্পর্কে মুসলিম মনীষীদের বক্তব্য:

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা প্রাচ্যবিদ পাশ্চাত্য মনীষীদের যাকাতের সৌন্দর্য, মাহাত্ম্য সংক্রান্ত ইনসাফপূর্ণ কথা সমূহ উল্লেখ করেছি। এখন আমরা কতিপয় মুসলিম সমাজ সংস্কারকের কথা উল্লেখ করবো। যাতে সাধারণ মুসলিমগণ হেদায়েত এবং নসিহত লাভ করতে পারেন।

ইসলামের মর্যাদা পুন:প্রতিষ্ঠার জন্যে যাকাত আদায় বাধ্যতামূলক করাই যথেষ্ট:

সাইয়্যেদ মুহাম্মদ রশীদ রেজা (র:) তার তাফসীরে লিখেছেন: "যাকাত দেয়া ফরজ করার মাধ্যমে ইসলাম অন্যান্য সব ধর্ম ও মতের উপরে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। সারা দুনিয়ার সুধী ও সমাজ বিজ্ঞানীরা এটি স্বীকার করেছেন। মুসলিম জাতি যদি তাদের দ্বীনের এই রুকনটা পুন:প্রতিষ্ঠা করে তাহলে আল্লাহ তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন এবং রিযিকে বিপুল প্রশস্ততা দিয়েছেন–এ স্বত্তেও যে গরীর লোক পাওয়া যাচ্ছে তা আদৌ দেখা যেত না। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক এ ফরজটি পালন করা ত্যাগ করেছে। আর এর দরুন তারা তাদের দ্বীন ও জাতির কাছে মহা অপরাধ করেছে। আর এ কারণেই তারা তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অন্যান্য জাতি সমূহের তুলনায় অত্যন্ত খারাপ ও নিকৃষ্ট হয়ে আছে।"[১০৬]

শায়খ মাহমুদ শালতুত, মুআজ (রা:) এর বর্ণিত, 'যা তাদের ধনি লোকদের থেকে নিয়ে তাদেরই গরীব লোকদের মাঝে বণ্টন করা হবে' এর ব্যাখ্যায় বলেন: "যাকাত ইসলামের দৃষ্টিতে উম্মতের ধনি শ্রেণীর লোকদের থেকে নিয়ে গরীবদের প্রতিনিধি স্বরূপ সে জাতির জন্যেই ব্যায় করা ছাড়া আর

[১০৫] আদ দিফা' আনিল ইসলাম ৬৯।
[১০৬] তাফসীর আল মানার, পৃষ্ঠা ২০।

কিছুই নয়। অন্য কথায় উম্মতের ধন-মাল তাদেরই কিছুর লোকদের কাছ থেকে নিয়ে অন্যদের জন্য ব্যয় করা। প্রথম হাত দাতার, আল্লাহর তাকে ধন-মালের সংরক্ষন তার প্রবৃদ্ধি সাধন এবং তা দিয়ে কাজ করার জন্য খলীফা বানিয়েছেন। এটা ধনি লোকদের হাত। আর অন্য হাতটি হচ্ছে শ্রমজীবী কর্মীদের হাত। তাদের শ্রম ও কাজ তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট পরিমান আয় করতে পারছে না। কিংবা কাজ করতেই অক্ষম হয়ে পড়েছে। এবং তার রিযিক ধনিদের ধন-মালে রেখে দেয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে মিসকিনদের হাত।"[১০৭]

আল্লামা শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী (র:) বলেন: "যাকাতের উজ্জলতম ও গভীরতম প্রভাবের দিক যা এ ফরজ কাজটির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত তা হচ্ছে ঈমান ও চেতনার দিক। তার সে প্রাণ শক্তি যা সরকার ধার্যকৃত কর থেকে তাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা অধিকারী বানায়। যাকাতের দ্বিতীয় উজ্জলতম দিক যার দরুন যাকাত সেসব কর ইত্যাদি থেকে স্বাতন্ত্র ও বিশিষ্টতা পায় তা হলো রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, 'তা গ্রহণ করা হবে তা গ্রহণ করা হবে তাদের ধনি লোকদের থেকে এবং তা ফিরিয়ে দেয়া হবে তাদেরই গরীব লোকদের মাঝে।' শরিয়াত প্রবর্তিত যাকাতের মূল তত্ত্বই হচ্ছে তাই। এ ব্যবস্থা চিরদিনই চলবে। যা পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে। যা কোন মানবীয় বিধান রচয়িতার বা আইন প্রনেতার অভিমতের উপর নির্ভরশীল হয়নি। কোন মানবীয় প্রসাশক বা আলিম তা প্রবর্তন করেন নি। যে সকল কর, টেক্স বা কাস্টম ডিউটি আজকের সরকারগুলো ধার্য করে থাকে যাকাত তার বিপরীত। কর যেমন গরীব মানুষের কাছ থেকে নেওয়া হয় তেমনি মধ্যবিত্তদের কাছ থেকেও নেয়া হয়। এবং ধনিশ্রেণী ও শক্তিশালীলোকদের কাছে তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তা সংগ্রহ করা হয় চাষি, কৃষক, শ্রমিক, শিল্পীদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জণ করা সম্পদ থেকে। আর ব্যয় করা হয় প্রজাতন্ত্রের নেতা-নেত্রী, এমপি-মন্ত্রী ও সরকারী বড় বড় আমলাদের দেশ-বিদেশে বিলাস ভ্রমনে অপচয় করার মাধ্যমে। দাওয়াত-যিয়াফত, আলোকসজ্জা, জমকালো অনুষ্ঠান, মদ আর নারী-পুরুষের যৌন নৃত্যের ঝড়, সরকারী পর্যায়ের

[১০৭] শায়খ মাহমুদ শালতুত লিখিত 'আল ইসলাম আক্বিদা ও শরিয়া' দ্রষ্টব্য।

ঝগড়া-বিবাদের মামলা-মোকাদ্দামা পরিচালনায়, দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকায় কৃত্রিম প্রপাগন্ডায় ব্যয় করা হয় জনগণের থেকে নেয়া করের টাকা। পক্ষান্তরে যাকাত হচ্ছে, ধনিদের থেকে নিয়ে গরীবদেরকে দান করা। এ যাকাতকে যদি প্রয়োজন হয় 'কর' বলার তাহলে তা পরিমানের দিক দিয়ে সর্বপ্রকার করের তুলনায় অত্যান্ত স্বল্প পরিমান। অতি সামান্য কষ্টের ব্যাপার। কিন্তু বরকত ও প্রতিফলের দিক দিয়ে অতীব বিরাট। ফায়দা অনেক ব্যাপক। কেননা তা নেওয়া হয় ধনি লোকদের কাছ থেকে আর ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাদেরই গরীবদের হাতে।

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ و بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ

وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّي اللهُ عَلَيْ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ،

৮ই রামাদান ১৪৩৩ হিজরী
২৭শে আগষ্ট ২০১২ ইসায়ী